করে দেখ
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

করে দেখ

(১ম খণ্ড)

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—অগ্রহায়ণ ১৩৮৯
—ডিসেম্বর ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩
—মে ১৯৮৬

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
অজয় গুপ্ত

মুদ্রক :
স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম : ৮ টাকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরেই বিজ্ঞানানুরাগী ছেলেমেয়েদের জন্যেও পরীক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ফলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রেরণায় ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে করতে পারে—এরূপ ছোটখাট কৌতুকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা জানিয়ে দেবার জন্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' কিশোরদের দপ্তর প্রবর্তিত হয়। এই বিভাগের 'করে দেখ' নামটি অধ্যাপক বসুরই দেওয়া। এই বিভাগ খোলবার কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল—ছেলেরা অতি দক্ষতার সঙ্গে এসব যন্ত্রপাতি তৈরি করে আমাদের দেখাতে নিয়ে এসেছে। ক্রমে সবাই মিলে প্রকাশ্য প্রদর্শনীতেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিজেদের তৈরি যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা দেখিয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। এই বিভাগে বহুসংখ্যক পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হওয়ার পর নানা জায়গা থেকে এই পরীক্ষাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার অনুরোধ আসতে থাকে। ফলে, কয়েকটি মাত্র পরীক্ষার বিষয় নিয়ে এই পুস্তকখানার প্রথমভাগ প্রকাশিত হলো। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য পরীক্ষার বিষয় দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হবে। পুস্তকখানি যদি সাধারণ বিজ্ঞানানুরাগীদের, বিশেষভাবে কিশোর বিজ্ঞানীদের অন্তত কিছুটা উৎসাহ এবং বিজ্ঞান প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করতে পারে তবে শ্রম সার্থক মনে করবো। ইতি—

—প্রকাশক

দেবযানী, রিঙ্কু, টুম্পা, কঙ্ক ও তাতাকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

বাংলার কীটপতঙ্গ
(রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত)
করে দেখ (২য়)
করে দেখ (৩য়)
গোপালচন্দ্র অমনিবাস

সূচীপত্র

ব্যালেন্সিং-এর খেলা

১.

সরু ডগার উপর একটা লম্বা পেন্সিলকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পার কি? চেষ্টা করে দেখো—কিছুতেই পারবে না ; কিন্তু সমকোণে খোলা (সোজা করে খুলবে না) একটি ছুরির ফলাকে পেন্সিলের ডগার কাছে বিঁধিয়ে দিলেই দেখবে—পেন্সিলটা একটু হেলানোভাবে
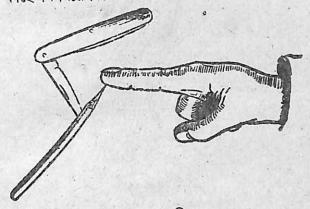
১নং ছবি

পেন্সিলটা আঙুলের ডগায় হেলানোভাবে দাঁড়িয়ে আছে

যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ছুরিটাকে পেন্সিলের গায়ে কিভাবে কোথায় বিঁধতে হবে, এক নম্বরের ছবি দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

২.

পাত্‌লা একখানা কাঠের উপর পেন্সিল দিয়ে দু-নম্বরের ছবিটির মত করে একটি টিয়াপাখীর ছবি এঁকে নাও। তারপর বাটালি দিয়েই

হোক, কি সরু করাত (ফ্রেট-স দিয়ে সহজেই কাটা যায়) দিয়েই হোক, পেন্সিলের দাগে দাগে পাখীটিকে কেটে নাও। তুলি দিয়ে রং করে নিলে দেখতে বেশ সুদৃশ্য হবে। লেজের শেষ প্রান্তে বেশ

২নং ছবি
ব্যালেন্স-করা কাঠের পাখী

বড় একটা ছিদ্র করে তার মধ্যে বেশ বড় পুরু একখণ্ড সীসার চাক্‌তি পরিয়ে দাও। দেখবে—পাখীটাকে সরু তারের উপর বসিয়ে রেখে দোল দিলেও পড়ে যাবে না।

৩

ভার বাঁকের খেলা

বাঁকের দুদিকে ভারী বোঝা ঝুলিয়ে মোট বইতে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। কোন কিছুর উপর একটা লাঠি খাড়া করে ধরে ঝুলানো বোঝা সমেত বাঁকটাকে তার উপর ঠিকভাবে বসিয়ে দিলে সেটা দাঁড়িপাল্লার মত ঝুলে থাকবে। কিন্তু লাঠিটাকে ধরে না

রাখলে সেটা যে কোন একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে যাবে। সহজ
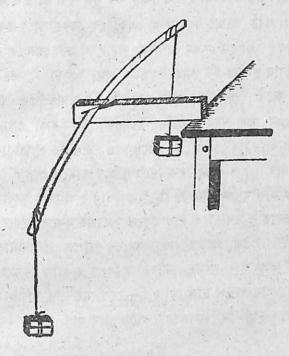
ভার-বাঁকের ব্যালেন্স

বুদ্ধিতেই এটা তোমরা বুঝতে পার। কিন্তু ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা কাঠকে কোন উঁচু জায়গায় শয়ানভাবে রেখে, ভারী বোঝা সমেত বাঁকটাকে তাতে কৌশলে বসিয়ে দিলে সেটা সেখান থেকেই ঝুলতে থাকবে—বলপ্রয়োগ না করে তাকে ফেলতেই পারবে না। কেমন করে এটা করা যায়, সে কথা বুঝিয়ে বলছি। তোমাদের মধ্যে যারা এই ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত নও, তারা এতটুকু চেষ্টা করে দেখতে পার।

প্রথমে ছবিখানাকে ভাল করে দেখে নাও। ছোট্ট কাঠখানার সঙ্গে আট্‌কানো একটা ভার-বাঁক শূন্যে ঝুলে আছে। প্রথমে এক

ইঞ্চি চওড়া আধ ইঞ্চি বা তারও কিছু কম পুরু এবং প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা কাঠ সংগ্রহ করে তার, একদিকে তেরছাভাবে একটা খাঁজ কেটে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো আছে, খাঁজটা যেন সে রকমেরই হয়। এবার দু-হাত কি আড়াই হাত লম্বা একটা বাঁশের বাখারি যোগাড় কর। বাখারিটা প্রায় এক ইঞ্চি কি আরও কিছু বেশী চওড়া এবং স্প্রিংএর মত নমনীয় হওয়া দরকার। দড়িবাঁধা কোন ভারী জিনিস বাখারিটার দু-প্রান্তে বেঁধে দাও। দড়ির প্যাঁচটাকে ছবির মত করে বাখারির সামনের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। বাখারি-টাকে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট কাঠখানার খাঁজের মধ্যে বসিয়ে দাও। এবার কাঠখানাকে ধরে উঁচুতে তুললেই বুঝতে পারবে বাঁকের ভারকেন্দ্রটা গিয়ে পড়েছে শয়ানভাবে স্থাপিত কাঠখানার অপর প্রান্তে। ভার-বাঁক সমেত কাঠখানার বিপরীত প্রান্ত টেবিলের ধারে আঙুলের ডগায় অথবা টাঙ্গানো দড়ি—যেখানেই রাখ বাঁকটা সেখানে ঝুলে থাকবে—দুলিয়ে দিলেও এটা পড়ে যাবে না।

৪.

পরপৃষ্ঠার ছবিখানার মত হাল্কা কাঠ বা টিনের একটা ঘোড়া সংগ্রহ কর। ইস্পাতের একটা সরু তার যোগাড় করে তার এক প্রান্তে বেশ ভারী একটা সীসার বল শক্ত করে এঁটে দাও। ঘোড়াটার ওজনের অনুপাতে সীসার বলটাকে বড় কিংবা ছোট করতে হবে। তারটা ছবির মত বাঁকানো হওয়া চাই। এবার সীসার বল সমেত তারটাকে ঘোড়ার বুকে বেশ শক্ত করে বসিয়ে দাও।

বলটাকে ঘোড়ার বুকে আট্‌কে দিলেই বুঝতে পারবে, শরীরের ভারকেন্দ্র গিয়ে পড়েছে তার পিছনের পায়ের উপর। এই অবস্থায়

—ঘোড়াটাকে পিছনের পায়ের উপর যে কোন সঙ্কীর্ণ জায়গায়

কাঠের ঘোড়াটা টেবিলের এক কোণে পিছনের
পায়ে ভর করে শূন্যে অবস্থান করছে

বসিয়ে দাও না কেন, সে পিছনের পায়ে ভর করে শূন্যেই অবস্থান করবে।

৫.

হাল্কা একটা লম্বা নলের তলার দিকটা যদি পারা বা সীসা ভর্তি করে ভারী করে দেওয়া যায়, তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? নলটা সর্বদাই খাড়া হয়ে থাকবে। চেপে ধরে কাৎ করতে পার বটে, কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাত্র সে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ ব্যবস্থা অন্য উপায়েও করা যায়। উপরের ছবিটা দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

দুই ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা কর্ক বা হাল্কা কাঠের উপরের দিকে মাথা এবং নীচের দিকে পায়ের মত তৈরি করে নাও। স্প্রিঙের

মত দুটো বাঁকানো ইস্পাতের তার, কর্ক বা কাঠটার গায়ে হাতের মত করে বেশ এঁটে বসিয়ে দাও। তার দুটোর প্রান্তভাগে পুতুলটার
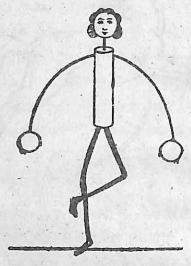
কর্কের পুতুল
তারের দুটো হাতে দুটো ভারী বল। পুতুলটাকে
সুতোর উপর বা আঙুলের ডগায় রাখ
সেটা খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে।

ওজনের অনুপাতে দুটো সীসার বল বসিয়ে দিতে হবে। দেখবে, বল দুটো বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুতুলটা খাড়া হয়ে থাকবে। এই অবস্থায় যেখানে রাখবে, পুতুলটা সেখানেই খাড়াভাবে অবস্থান করবে। প্যাকাটি, ঝাঁটার কাঠি এবং মাটির ডেলা দিয়েও এটা করতে পার।

৬.

প্রথমে দুখানা চ্যাপটা কাঠ যোগাড় কর। একখানা হাত দেড়েক লম্বা, আর একখানা হাতখানেক বা আরও কিছু ছোট হলেও চলবে। লম্বা কাঠখানার উপর জল-ভর্তি একটা বালতি ঝুলিয়ে

দাও। ছোট কাঠখানা তেরছাভাবে বাল্‌তির মধ্যে ঢুকিয়ে বড়খানার সঙ্গে এমনভাবে ঠেকা দিয়ে দাও, যাতে জলসমেত বাল্‌তিটা অনেকটা
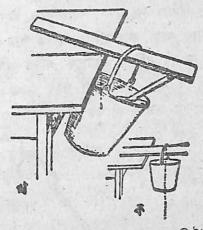
দুখানা কাঠের সাহায্যে জল-ভরা বাল্‌তিটাকে ব্যালেন্স করা হয়েছে

হেলানোভাবে ঝুলে থাকে। খ-চিহ্নিত ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে, ছবি দেখেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। এবার বাল্‌তি সমেত বড় কাঠখানাকে টেবিলের ধারে বা যে কোন একটা স্ট্যাণ্ডের উপর রেখে দাও। দেখবে, অত ভার নিয়েও বাল্‌তি কেমন কাঠটাকে নিয়ে ঝুলে আছে। দুলিয়ে দিলে উপরে নীচে দোল খাবে বটে, কিন্তু পড়ে যাবে না। বাল্‌তিটাকে যদি ঠেকা দিয়ে হেলানোভাবে না রেখে ক-চিহ্নিত ছবির মত সোজাভাবে কাঠখানার সঙ্গে ঝুলিয়ে দাও তবে কিছুতেই তাকে টেবিলের ধারে বা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে রাখতে পারবে না।

৭.

বোতলের মুখে আঁটা ছিপির উপর খাড়াভাবে একটা স্চ অথবা আলপিন বসানো রয়েছে। একটা পয়সা বা আধুলিকে ওই স্চ বা

আলপিনটার ডগায় খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পার কি ? চেষ্টা করে দেখো—কিছুতেই খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু সাধারণ একটা কৌশলে একটা পয়সা বা আধুলিকে অনায়াসে স্চ বা আলপিনের ডগায় খাড়া করে বসিয়ে রাখতে পার। এমন কি, স্চ বা আলপিনের ডগায় বসিয়ে সেটাকে এদিক-ওদিক একটু দুলিয়ে দিলেও পড়ে যাবে না। কৌশলটা খুবই সহজ। ধারালো ছুরি দিয়ে একটা কর্কের তলার দিকের খানিকটা লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেল। কর্কের সেই চেরা দিকটায় একটা আধুলি জোর করে অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দাও। খাবার টেবিলে যে রকম কাঁটা-চামচ ব্যবহৃত হয়, ঠিক সে রকমের দুটো কাঁটা যোগাড় কর। কর্কটার গায়ে পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে হেলানভাবে কাঁটা দুটোকে ফুটিয়ে দাও।
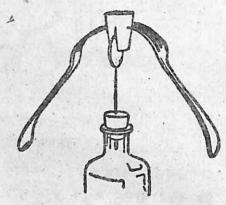
একটা আধুলিকে পিনের ডগায় খাড়াভাবে রাখা হয়েছে

এবার কর্কে আট্কানো আধুলিটাকে সব সমেত স্চ বা আলপিনের ডগায় বসিয়ে দাও। দেখবে—কর্কে আটকানো কাঁটা দুটো নিয়ে আধুলিটা আলপিনের ডগায় খাড়াভাবেই বসে থাকবে। একটু দুলিয়ে দিলেও কয়েকবার দোল খেয়ে ঠিক একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে—পড়ে যাবে না। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ব্যবস্থাটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না।

বিদ্যুতের খেলা

১.

তোমরা অনেকেই হয়তো বিদ্যুতের অনেক-রকম খেলা দেখেছ।
এখানে তোমাদের জন্যে সেরূপ কয়েকটি অতি সাধারণ বিদ্যুতের
খেলার কথা বলছি। এই খেলাগুলির প্রত্যেকটিই তোমরা অনায়াসে
নিজের হাতে করে দেখতে পারবে। কারণ এই পরীক্ষাগুলিতে যে
সব জিনিষের দরকার হবে, সেগুলি-সংগ্রহ করতে তোমাদের মোটেই
বেগ পেতে হবে না।

খুব পাত্‌লা অথচ শক্ত একখানা কাগজ থেকে নয় ইঞ্চি লম্বা,
আধ ইঞ্চি চওড়া এক ফালি কাগজ কেটে নাও। এই কাগজের
ফালিটার দু-প্রান্ত আঠা দিয়ে জুড়ে সম্পূর্ণ গোলাকার একটা
রিং-এর মত তৈরি কর। কাগজের রিংটা এমন নিখুঁতভাবে তৈরি
করবে, জোড়ামুখ যেন একটুও উঁচু-নীচু হয়ে না থাকে। মসৃণ
টেবিলের উপর রিং-টাকে খাড়াভাবে রেখে ফুঁ দিয়ে দেখবে
যেন বেশ গড়িয়ে যেতে পারে। এবার একটা গালার রড্
(সিল-মোহর করবার জন্যে যে গালার রড্ পাওয়া যায়) অথবা
কাচের রড্ (ফ্লিণ্ট গ্লাস অথবা লেড্ গ্লাসের রড্ ব্যবহার করা
দরকার) যোগাড় কর। একখণ্ড ফ্লানেল নিয়ে রড্‌টাকে কিছুক্ষণ
বেশ করে ঘষে নাও। ঘষবার পর রড্‌টাকে ছোট ছোট সুতোর
ফেক্‌রি, চুল বা কাগজের টুক্‌রোর কাছে নিয়ে এসো। দেখবে—
রড্‌টা যেন চুম্বকের মত ব্যবহার করছে। কাগজ, সুতো প্রভৃতির
টুকরোগুলি লাফিয়ে উঠে রড্‌টার গায়ে লেগে যাবে। ফ্লানেল দিয়ে
ঘষবার আগে কিন্তু রড্‌টার এই গুণ দেখতে পাবে না। ঘষবার
ফলে রড্‌টা তড়িতাবিষ্ট হয়। এই তড়িতাবেশই সুতো কাগজ প্রভৃতি

হাল্কা পদার্থের টুক্‌রোগুলিকে আকর্ষণ করবার কারণ।

আচ্ছা, এবার কাগজের রিঙের পরীক্ষাটা করে দেখ। কাগজের রিংটাকে টেবিলের উপর রেখে ফ্লানেল-ঘষা গালা বা কাচের রড্‌টাকে একটু কাছে নিয়ে এস। দেখবে, কাগজের রিংটা গড়িয়ে এসে রডের গায়ে লাগতে চাইবে। তুমি যদি সেটাকে রডের গায়ে লাগতে না
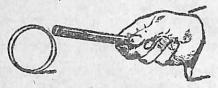
কাগজের রিং ও কাচের রডের পরীক্ষা

দিয়ে ক্রমাগত সরিয়ে নাও তবে কাগজের রিংটাও চাকার মত গড়িয়ে গড়িয়ে টেবিলের সর্বত্র তাকে অনুসরণ করতে থাকবে। ছবি থেকেই ব্যাপারটার পরিষ্কার ধারণা করতে পারবে।

২.

পাত্‌লা একখণ্ড সাধারণ লেখবার কাগজ একটু গরম করে নাও। কাগজখানাকে টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ বেশ করে ঘষে দাও। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে, কাগজখানা যেন টেবিলের সঙ্গে লেগে গেছে—টেবিলটাকে কাৎ করলেও গড়িয়ে পড়ে
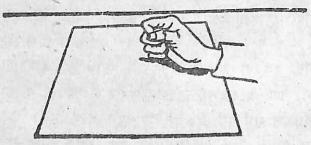
কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে ঘষা হচ্ছে

না। এবার যদি হাত দিয়ে কাগজখানার একটা কোণ খানিকটা তুলে

ধর—দেখবে, কাগজটা যেন লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে। কাগজখানা টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে তোমার হাতে বা জামা-কাপড়ে আটকে থাকতে চাইবে। এ রকমের কাগজ মুখের কাছে ধরলে সুড়সুড়ির মত একটা অবস্থা অনুভব করবে। ঘর্ষণের ফলে কাগজখানা তড়িতাবিষ্ট হয় বলেই অন্য কোন নিস্তড়িৎ পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

৩
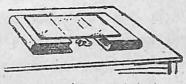
কাগজের টুক্‌রোর লাফানো

টেবিলের উপর পরস্পর থেকে কিছুটা তফাতে দুখানা বই রাখ। বই দুখানার উপর একখানা চওড়া কাচ বসিয়ে দাও। কাচখানার তলায় টেবিলের উপর ছোট ছোট কতকগুলি কাগজের টুক্‌রো রেখে দাও। এবার কাচখানাকে বেশ কিছুক্ষণ ঘষতে থাক। কিছুক্ষণ ঘষবার পরেই দেখবে, নীচের কাগজের টুক্‌রোগুলি অদ্ভুত রকমে লাফাতে সুরু করেছে। কাগজের টুক্‌রোগুলি যদি ব্যাং বা কয়ারফড়িং প্রভৃতির আকারে কাটা হয়, তবে এই লাফানোর ব্যাপারটা বেশ কৌতুকপ্রদ হবে। কাচখানা তড়িতাবিষ্ট হবার ফলেই এরূপ অবস্থা ঘটে। কিরকম করে কাচখানা রাখতে হবে, ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

এসব পরীক্ষা করবার সময় জিনিষগুলিকে বেশ করে শুকিয়ে বা গরম করে নেওয়া দরকার। শীতকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় এজন্যে পরীক্ষাগুলি সহজে করা যায়; কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলেই পরীক্ষার ব্যাপারে অনেকটা অসুবিধা হবে।

৪.

তোমরা লক্ষ করে থাকবে রারার বা ওই ধরনের কোন পদার্থের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ালে চুলগুলি যেন খাড়া হয়ে ওঠে এবং অস্ফুট মট্‌মট্‌ আওয়াজ শোনা যায়। অবশ্য শুষ্ক আবহাওয়াতেই এরূপ ব্যাপার বেশী ঘটে। চুলের সঙ্গে চিরুণীর ঘর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তার ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। আর একটা সহজ পরীক্ষায় এই ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পার। অবশ্য শীতকালেই এই পরীক্ষাটা বেশী ভাল হয়। উনুনের পাশে বসে শরীরটাকে বেশ গরম করেছে, এ-রকমের একটা বিড়ালের পিঠের উপর ক্ষিপ্র গতিতে সোজা বা উল্টোদিক থেকে হাত বুলাতে থাকো। কিছুক্ষণ পরেই দেখবে—বিড়ালটার লোমগুলি সব খাড়া হয়ে উঠেছে এবং অস্ফুট মট্‌মট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘর্ষণজনিত তড়িৎ উৎপত্তির ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে

বিড়ালের সাহায্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন
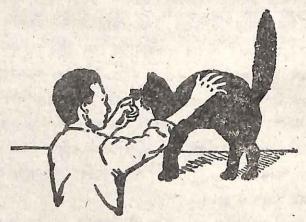
থাকে। ঘর্ষণের পর যদি তোমার হাত মুঠো করে বিড়ালটার নাকের কাছে আন, তবে একটা পরিষ্কার বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ তার নাকের ডগা

থেকে তোমার হাতের মধ্য দিয়ে চলে যাবে। এতে বিড়ালটাও আঁতকে উঠবে। অন্ধকার ঘর এবং কালো বিড়ালের সাহায্য নিলে এই পরীক্ষায় বেশ সুন্দরভাবে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যেতে পারে।

৫.

খুব পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়ামের পাত কেটে এরোপ্লেনের মত তৈরি কর। একটা এবোনাইট রড্‌কে ফ্লানেল দিয়ে বেশ করে ঘষে নাও। রড্‌টাকে এরোপ্লেনটার কাছে আনবামাত্রই সেটা লাফিয়ে উঠে এসে তার গায়ে লেগে যাবে এবং রডের তড়িৎ খানিকটা আহরণ করবে। উভয়েই তখন সহধর্মী তড়িতাবিষ্ট হওয়ায় এরোপ্লেনটা তৎক্ষণাৎ আবার রড্ থেকে লাফিয়ে সরে যাবে। এই অবস্থায় রড্‌টাকে পিছু পিছু চালিয়ে নিলে যতক্ষণ খুশী যে কোন দিকে এরোপ্লেনটাকে উড়ন্ত অবস্থায় রাখা যেতে পারে।

এরোপ্লেনের খেলা

স্বয়ংক্রিয় কাচগোলক

এবার তোমাদের চমৎকার একটা বৈজ্ঞানিক খেলার কথা বলবো। একটু চেষ্টা করলে অনায়াসেই যন্ত্রটা তৈরি করে প্রচুর আমোদ পেতে পার।

৫।৬ ইঞ্চি লম্বা সরু একটা কাচের নলের দু-দিকে দুটো কাচের ফাঁপা বল। দেখতে অনেকটা ডাম্বেলের মত। পাল্লার দাঁড়ির মত ডাম্বেলটা একটা স্ট্যাণ্ডের উপর আলতোভাবে বসানো রয়েছে। স্ট্যাণ্ডসমেত যন্ত্রটাকে রোদে বসিয়ে দিলেই ডাম্বেলটা যদি একবার এদিক আবার ওদিক অনবরত ওঠা-নামা করতে থাকে, তবে সেটাকে যন্ত্র-কৌশলের একটা অদ্ভুত খেলা বলে মনে হবে না কি? ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার। অবশ্য ডাম্বেলের মত কাচের জিনিসটা তৈরি করতে বড়দের সাহায্য নিতে হবে। কাচ গলিয়ে যারা নানারকম জিনিস তৈরি করে, তাদের দিয়ে কাচের ডাম্বেলটা তৈরি করে নিতে পারলে বাকীটা তোমরা নিজের হাতেই করতে পারবে।

একটা কাচের নলের দু'পাশে দুটো ফাঁপা বল থাকবে। বল দুটোকে ডাম্বেলের মত ঠিক সোজাসুজি না রেখে একদিকে সম-কোণে বাঁকিয়ে দিতে হবে। মুখ বন্ধ করে দেবার আগে একটা বলের অর্ধেকের কিছু বেশী জল ভর্তি করে সেটাকে আগুনের উপর ধরলেই জল গরম হয়ে বাষ্প উঠতে থাকবে। এর ফলে বলের ভিতরকার বাতাস বেরিয়ে যাবে। বাষ্প বেরুবার সময় বলের খোলা মুখটির কাচ গলিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। অপর বলটাকেও গরম করে মুখ বন্ধ করতে হবে। ঠাণ্ডা হলেই বাষ্প জলে পরিণত হবে এবং জল ছাড়া বাকী জায়গাটুকু বায়ুশূন্য থাকবে। একটা বলের অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি, অপরটা খালি। এই অবস্থায় বল দুটোকে উপরের দিকে রেখে নলটাকে শয়ানভাবে ধরে, জলের দিকটায় একটু তাপ দিলেই দেখবে—জল থেকে কিছু পরিমাণে বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছে। এই বাষ্পের চাপে জলটা ক্রমশঃ সরে গিয়ে খালি বলটায় উপস্থিত হবে। কাচের এই যন্ত্রটাকে যদি একটা স্ট্যাণ্ডের উপর ঢেঁকিকলের মত বসিয়ে দেওয়া যায়

তবে বেশী জল ভর্তি বলটা জলের ভারে নীচের দিকে নেমে যাবে। এমন কোন কৌশলে যদি একবার এ-বলের জলকে ও-বলে, আবার ও-বলের জল এ-বলে নেবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কাচের ডাম্বেলটা পর্যায়ক্রমে একবার এ-দিকে আবার ও-দিকে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

কি কৌশলে এরূপ করা যেতে পারে, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে ছবি দেওয়া হলো। ছবিখানা মনোযোগ দিয়ে দেখে নাও, তাহলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।
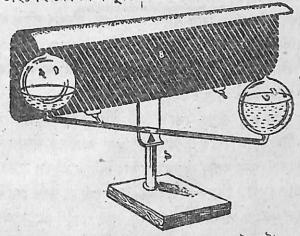
স্বয়ংক্রিয় কাচ-গোলক। রোদে রাখলেই যন্ত্রটা
ঢেঁকিকলের মত ওঠা-নামা করতে থাকে

১নং একটা স্ট্যাণ্ড উপরে ঢেঁকিকলের মত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাচের নলটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা পিতলের পাত চোঙের মত গোল করে এঁটে দিয়ে তার নীচের দিকে তেকোণা কাচের মত ছোট্ট একটু লোহা বা পিতলের টুক্‌রো জোড়া দেওয়া হয়েছে। এই তেকোণা টুক্‌রোটুকুর উপরেই ২ এবং ৩ নম্বরের বল সমেত কাচের নলটা ঢেঁকিকলের মত বসানো আছে।

১নং স্ট্যাণ্ডের পিছনের দিকে ৪ নম্বরের জিনিসটার মত পিতল বা টিনের একখানা পাত্‌লা পর্দা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই টিন বা

পিতলের পর্দাখানার পিছনের দিকটা থাকবে খুব চক্‌চকে পালিশ করা আর সামনের দিকটা কালো রং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এই পর্দার নীচে দুদিকে দুটো পিন ছবির মত করে বসানো থাকবে; ফলে বল দুটো কোন রকমেই নির্দিষ্ট সীমা ছেড়ে বেশী উঁচুতে উঠতে পারবে না।

পর্দার চক্‌চকে দিকটা আলোর দিকে রেখে যন্ত্রটাকে এবার রোদে বসিয়ে দাও। উত্তপ্ত চুল্লী বা অন্য কোন উজ্জ্বল আলোকাধারের কাছেও রাখতে পার। এমনভাবে বসাবে পর্দার চক্‌চকে দিকটা যেন আলো অথবা উত্তাপের দিকে থাকে। দেখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আলো বা উত্তাপ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বল দুটো আপনা-আপনিই ওঠা-নামা করছে। বল দুটোর সামনের দিকের অর্ধাংশ কালো করে দিলে এই ওঠা-নামা আরও দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে।

কেন এমন হয় বুঝেছ তো? ধর ছবির ৩নং বলটা পিতলের পর্দাটার নীচে নেমে গেছে। কাজেই ৩নং বলটাতে আলো অথবা তাপ লাগবে। ২নং বলটা থাকবে ছায়ার মধ্যে; কালো রঙের জন্যে সেটাতে তাপও প্রায় কিছুই লাগবে না। আলো বা তাপ লেগে ৩নং বলের মধ্যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হবে। এরই চাপে ৩নং বলের জল ধীরে ধীরে ২নং বলে প্রবেশ করতে থাকবে। যখন ২নং বলের জলের পরিমাণ ৩ নম্বরের চেয়ে কিছু বেশী হবে, তখনই ভারে ২নং বলটা নীচে নেমে আসবে এবং ৩ নম্বরের বলটা যাবে ছায়ার মধ্যে। এবার ২ নম্বরের বলটা আলোতে চলে আসবার ফলে সেটার মধ্যে বাষ্প উৎপন্ন হবে এবং বাষ্পের চাপে জল আবার ৩নং বলে প্রবেশ করে সেটাকে নীচে নামিয়ে আনবে। এভাবে ক্রমাগত ওঠা-নামা চলতেই থাকবে।

ঠাণ্ডা দিয়ে জল ফোটানো

একটা পাত্রে জল রেখে সেটাকে জ্বলন্ত উনুনে চাপিয়ে দিলে কিছুক্ষণ বাদেই জলটা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে—এটা তোমরা সবাই দেখেছ। উপযুক্ত উত্তাপ পেলে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে—এটা

খোলামুখ ফ্লাস্কে জল ফোটানো হচ্ছে
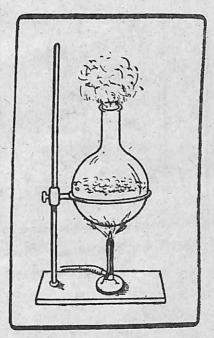
কিছুমাত্র অদ্ভুত ব্যাপার নয়। কিন্তু উত্তাপের পরিবর্তে ঠাণ্ডা দিলে জল যদি টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে, তবে সেটাকে তোমরা নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে করবে। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবে না যে, ঠাণ্ডা দিলে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুতও নয় বা অস্বাভাবিকও নয়। ঘরে বসে যাতে সহজেই

পরীক্ষা করে দেখতে পার, সে উপায়টা বলে দিচ্ছি। দেখবে, ঠাণ্ডা দিলে জল কেমন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে!
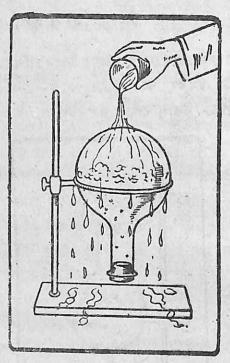
ছিপি আঁটা ফ্লাস্কটাকে এবার স্ট্যাণ্ডের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে

ছবিতে যেমন আঁকা আছে, সেরূপ একটা কাচের ফ্লাস্ক যোগাড় করে নাও। যে কোন রকম কাচের শিশি-বোতলে চলবে না, কারণ একটু বেশী তাপ দিলেই সেগুলি ফেটে যাবে। ওই রকমের ফ্লাস্ক যে কোন সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেণ্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ফ্লাস্কটাকে প্রায় অর্ধেক জল ভর্তি করে মুখ খোলা রেখেই লোহার একটা স্ট্যাণ্ডের গায়ে আটকানো রিং-এর উপর ছবির মত করে বসিয়ে দাও। তারপর গ্যাস-বার্ণার জ্বেলেই হোক বা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলেই

হোক, ফ্লাস্কটার তলায় উত্তাপ দিতে থাক। জল যখন টগ্ বগ্ করে ফুটতে থাকবে এবং ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুতে থাকবে, তখন গ্যাস-বার্ণারটাকে সরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা রাবারের ছিপি দিয়ে ফ্লাস্কের মুখটাকে বেশ ভাল করে বন্ধ করে দাও। গ্যাস-বার্ণার বা স্পিরিট-ল্যাম্পটাকে সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—আস্তে আস্তে ফ্লাস্কের জলের টগ্ বগানি থেমে গেছে এবং জলটা ঠিক সমতলে শান্তভাবে রয়েছে। এবার জলসমেত ফ্লাস্কটার মুখ নীচু দিকে রেখে দ্বিতীয় ছবিটার মত করে রিং-এর উপর বসিয়ে দাও। ফ্লাস্কের তলার গোল দিকটা থাকবে এবার উপরের দিকে। এবার এক গ্লাস জল ঢেলে দাও। দেখবে, ফ্লাস্কের ভিতর সেই শান্ত জল আবার টগবগ করে ফুটে উঠছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষাটা করতে পারলে একবারেই কৃতকার্য হবে।

কেন এমন হয়, বলতে পার? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। খাল, বিল, পুকুরের জলকে সর্বদাই আমরা শান্তভাবে থাকতে দেখি। আদতে কিন্তু সে অত শান্ত নয়। একটু সুবিধা পেলেই সে অশান্ত হয়ে ওঠে এবং বাষ্প হয়ে উবে যেতে চায়। বায়ুমণ্ডলের প্রবল চাপে সে তা পেরে ওঠে না। এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া স্থানের উপর বায়ুর চাপ হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত সের। হিসেব করে দেখ, সামান্য এক গ্লাস জলের উপরেই তাতে কত চাপ পড়ে! যদি কোন রকমে এই চাপ সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে জল মুক্তি পেয়ে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দাপাদাপি করে উবে যাবার চেষ্টা করে। তার ফলেই সুরু হয় টগ্ বগানি। গরম দিলে জলের উপরকার বাতাস হাল্কা হয়ে সরে যায় আর বাষ্প তার স্থান অধিকার করে। কাজেই বাষ্প ওঠবার সময় ফ্লাস্কের ছিপি বন্ধ করলে তার মধ্যে বাতাস কিছুই থাকে না। তবুও আবদ্ধ বাষ্পের চাপে জলকে শান্তভাবে অবস্থান করতে হয়। ফ্লাস্কটাকে উল্টো করে অনেকটা জায়গায় এক সঙ্গে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে ভিতরের বাষ্প তৎক্ষণাৎ জমাট বেঁধে জলকণারূপে ফ্লাস্কের

জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং সে সময় বাতাস বা বাষ্প কিছুই না থাকাতে জল অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে চাপমুক্ত হয়ে লাফালাফি সুরু করে দেয়।

সাইফন

১.

তাকের উপর একটা গ্লাসে খানিকটা জল রয়েছে। গ্লাসটাকে কাৎ না করে—এমন কি, কোন রকম নাড়াচাড়া না করে, সবটা জল কেমন করে নীচের গ্লাসে আনা যায়—বল দেখি? গ্লাসের তলায় একটা ফুটো থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজ হতো; কিন্তু তাও নেই। তবে কেমন করে সম্ভব?

তোমরা অনেকেই হয়তো সাইফনের কথা জান। সাইফন একটা বাঁকানো নল; কাচেরও হতে পারে, রবারেরও হতে পারে। গ্লাসটাকে
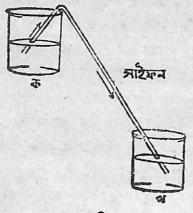
১নং চিত্র

সাইফনের ক্রিয়া

কাৎ না করে বা কোন রকম নাড়াচাড়া না করে সাইফনের সাহায্যে সবটুকু জল অনায়াসেই নীচের গ্লাসে আনা যায়। ১ নম্বরের ছবিটা দেখে নাও। নলের বাঁকানো দিকটা উপরের গ্লাসের জলের তলা

পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে নীচের দিকটায় মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে জল চলে আসবে এবং উপরের গ্লাসের সবটুকু জল নীচের গ্লাসে এসে জমা হবে। তাছাড়া আর এক রকমেও এটা করতে পার। নলটাকে জলে ভর্তি করে আঙুল দিয়ে মুখ বন্ধ কর এবং বাঁকানো মুখটা গ্লাসের জলে ডুবিয়ে আঙুল ছেড়ে দাও। দেখবে একই রকমের ফল হচ্ছে।

২.

আচ্ছা, এবার ২ নম্বরের ছবিটা দেখ। ইংরেজী U অক্ষরের মত একটা বাঁকানো নল টিনের পাত্রের তলায় ছবির মত করে বসানো রয়েছে। টিনের পাত্রটাকে যদি ক খ লাইন অবধি জলপূর্ণ করা যায়, তাহলে দেখবে—গ ঘ লাইন অবধি সবটুকু জল নলের মধ্য দিয়ে নীচে চলে যাবে।

২নং চিত্র
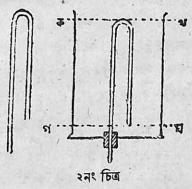
ময়লা পরিষ্কার করবার জন্যে সহরের বাড়ীর বাথরুমে সিস্টার্নের ব্যবস্থা দেখেছ তো—শিকল টানলেই হু হু করে জল বেরিয়ে আসে? U অক্ষরের মত বাঁকানো সাইফনের সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে? ছবিটা দেখে নাও। সিস্টার্নের একপাশে উপরের দিকে জলের পাইপ রয়েছে। পাইপের মুখে আছে একটা ভাল্‌ভ্‌। ভাল্‌ভের সঙ্গে সংলগ্ন লম্বা হাতলের মাথায় লাগানো রয়েছে একটা ফাঁপা বল; সিস্টার্নের মধ্যস্থলে বসানো আছে সাইফন। সিস্টানে

জল ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলটাও উপরে উঠতে থাকে। ফলে, জল সাইফনের বাঁকানো অংশ ডুবিয়ে দেবার আগেই পাইপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ঘণ্টার মত আকৃতিবিশিষ্ট একটা ধাতব পাত্র সিস্টার্নের
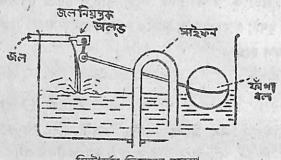
সিস্টার্নের ভিতরের ব্যবস্থা

মধ্যে সাইফনটাকে ঢেকে রাখে (ছবিতে সেটা দেখানো হয় নি)। শিকলের টানে ঘণ্টার সঙ্গে জল উপরে উঠে গিয়ে সাইফনের বাঁকানো অংশটাকে জলপূর্ণ করে ; ফলে সিস্টার্নের সবটুকু জল সাইফন দিয়ে হু হু শব্দে বেরিয়ে আসে। বুদ্ধি করে তোমরা এর একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থারও পরীক্ষা করে দেখতে পার।

৩.

গোটা তিনেক কাচের গ্লাস নাও এবং ছুটো গ্লাসে জল ভর্তি কর ; ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকানো ছুটো কাচের নল যোগাড় করতে হবে। বাঁকানো নলের পাশাপাশি বাহু ছুটো হবে গ্লাসের চেয়েও লম্বা ; মধ্যের অংশটা ইচ্ছামত লম্বা করতে পার। কাচের বাঁকানো নল ছুটোকে জলে ভর্তি কর। আঙুলে দু-মুখ চেপে ছবির মত করে নল ছুটোকে গ্লাসের জলে উবুড় করে বসিয়ে দাও। এবার এক একটা গ্লাসকে একটু উঁচু-নীচু করলেই অথবা ছুই গ্লাসের জলের 'লেভেল' সমান না থাকলেই দেখবে—এক গ্লাসের জল আর এক গ্লাসে চলে আসছে। এক বাল্‌তি জলের মধ্যে যদি এ রকমের জল ভর্তি একটা বাঁকানো নল বসাও এবং বাল্‌তির বাইরে নলের বাহুটি যদি বাল্‌তির

তলা থেকে কিছুটা নীচুতে নামাও তবে দেখবে, বাল্‌তির তলার শেষ জলটুকু নল বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে।
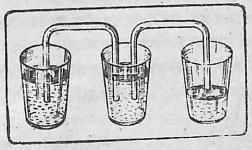
সাইফনের ক্রিয়া

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

১.

এবার তোমাদের এক রকমের খেলনা ফোয়ারা তৈরির কথা বলছি। তিনটে সরু কাচের নল, দুটো কাচের ফাঁপা বল, আর কয়েকটা মোটা কর্কের ছিপি যোগাড় করতে পারলেই হলো। ঠিক ছবির মত জিনিসটাকে তৈরি করতে পারলে দেখবে—কিছুটা জল ঢেলে দিলেই ফোয়ারার মুখ থেকে আপনা-আপনি জল উপরের দিকে ছিট্‌কে উঠতে থাকবে। ব্যাপারটা খেলনা হলেও এ থেকে বাতাসের চাপ, উপরে জল তোলবার বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। দু-হাজার বছরেরও আগে হিরো নামে আলেকজাণ্ড্রিয়ার একজন গাণিতিক ও দার্শনিক এই অপূর্ব জিনিষটিকে সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলেন।

জিনিষটা কি রকম হবে—ছবিটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। উপরের অংশটা চায়ের পিরিচের মত একটা জিনিষ। এর মাঝখানে বেশ মোটা একটা ছিদ্র আছে। এই জিনিষটা মাটি, কাঠ, টিনের পাত বা অন্য যে কোন কিছুর তৈরি হলেই চলবে।

পিরিচের মাঝখানে ছিদ্রের মধ্যে একটা মোটা কর্কের ছিপি আঁটা। ছিপিটার মধ্যস্থলে ও এক পাশে ছুটো সরু ছিদ্র থাকবে। আই-ড্রপারের মত সরু-মুখ একটা কাচের নল কর্কের মধ্যের ছিদ্রটাতে ছবির মত করে বেশ এঁটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটা লম্বা কাচের নল পাশের ছিদ্রটাতে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাচের ফাঁপা বল ছুটো, বোতলের মুখের মত উপরে ও নীচের দিকে ছিদ্র-করা কর্ক দিয়ে আঁটা। সবচেয়ে লম্বা কাচের নলটাকে, ছবিতে যেমন আছে তেমনি করে কাচের বল ছুটোর কর্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেশ করে এঁটে দিতে হবে। তাছাড়া আর একটা বড় ও একটা ছোট কাচের নল ছবির মত করে পরিয়ে দিতে হবে। কাচের বলটাকে ছবির মত যে কোন একটা স্ট্যাণ্ডের উপর এঁটে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। উপরের কাচের বলটার মধ্যে আগে থেকেই প্রায় পুরোপুরি জল ভর্তি করে দেবে। নীচের বলটা থাকবে খালি।
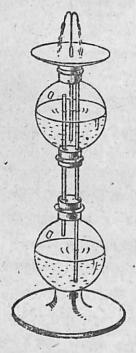
হিরোর ফোয়ারা

এবার পিরিচখানার মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দাও। পিরিচের জল লম্বা নলের ভিতর দিয়ে নীচের বলের মধ্যে জমতে থাকবে। জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই বলের বাতাস ছোট নলটার ভিতর দিয়ে উপরের বলের মধ্যে প্রবেশ করে জলের উপর চাপ দেবে। বাতাসের এই চাপের ফলে উপরের বলের জল সরু-মুখ নলটা দিয়ে ফোয়ারার মত উপরের দিকে ছিটকে উঠতে থাকবে। ফোয়ারার জলটা পিরিচখানার

মধ্যেই পড়বে। সেই জলটা আবার লম্বা নল দিয়ে ক্রমাগত নীচের বলটার জলের উপর বাতাসের চাপ বাড়িয়ে তুলতে থাকবে। এর ফলে উপরের বলের ভিতরকার সব জলটাই ধীরে ধীরে ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে আসবে।

এখানে কাচের জিনিসের কথাই বলেছি। বুদ্ধি করে যদি অন্য কিছু দিয়ে তৈরি করতে পার তাতেও একই রকমের কাজই হবে। এই জিনিষটাকে ঠিক ছবির মত না করে অন্যভাবেও করা যেতে পারে। জলটা কেন আপনা-আপনি ফোয়ারার মত উপরে উঠে যায়—এই রহস্যটা যদি বুঝতে পেরে থাক, তবে তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি করে আরও অন্যান্য কৌশলে এ রকমের জিনিষ তৈরি করতে পারবে।

২.

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা তৈরির আর একটা কৌশলের কথা বলছি। এটা হিরোর যান্ত্রিক কৌশলের চেয়ে অনেকটা সহজ। তবে এই যন্ত্রটা কোন গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে হবে। ছবিটা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে—কেমন করে জল আপনা-আপনি ফোয়ারার মত উপরের দিকে ছিটকে ওঠে। ডান দিকের নলটার মুখ একটা গ্লাসের মত করা হয়েছে। প্রথমে এখানে জল ঢেলে দিলে জলটা বাঁ-দিকের নলের নীচের ফাঁপা বলটা ভর্তি করে উপরের দ্বিতীয় বলটাকেও ভর্তি করবে। তারপর যন্ত্রটাকে আস্তে কাৎ করে নীচের বল থেকে জলটুকু ফেলে দাও।

উপরের বলটা জলে ভর্তি থেকে যাবে। নীচের বলটার মধ্যে এবার জল থাকবে না বটে, কিন্তু বাতাস থাকবে। এবার আবার ডান-দিকের নলের গ্লাসের মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দাও। জলটা নীচের দিকে নামতে থাকবে। ফলে নল ও নীচের বলের মধ্যকার বাতাসের উপর চাপ পড়বে। এই চাপ গিয়ে পড়বে আবার বাঁ-দিকের উপরের বলের ভিতরকার জলের উপর। বাতাসের এই চাপে উপরের বলের জল নলের সরু মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত ছিট্‌কে উঠবে।

যন্ত্রটাকে কায়দামত একটু কাৎ করে ধরলেই ফোয়ারার মুখের জলটা বাইরে না পড়ে ডান-দিকের গ্লাসের মত পাত্রটার মধ্যে পড়বে। কাজেই নীচের বলটা ক্রমাগতই জলভর্তি হতে থাকবে এবং

বাঁকানো নলের স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

বাতাসের চাপে উপরের বলের জলটাও ফোয়ারার মত আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসতে থাকবে।

আর্কিমিডিস্ স্ক্রু

তোমরা আর্কিমিডিসের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই! খৃষ্টের জন্মের পূর্বে এত বড় বৈজ্ঞানিক আর জন্মগ্রহণ করেন নি। সে যুগে তিনি যে সব জিনিষ আবিষ্কার করে গেছেন, আজও আমরা সেগুলিকে কাজে লাগাচ্ছি। তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীগুলি এতই অদ্ভুত যে, তোমরা শুনে কেবল বিস্মিতই নয়, মুগ্ধও হয়ে যাবে। এখানে কেবল তাঁর একটা সাধারণ আবিষ্কারের কথা বলছি—যেটা তোমরা অনায়াসেই করে দেখতে পার! নীচ থেকে উপরে জল তোলবার জন্যে আজকাল বিভিন্ন ধরনের পাম্প, বায়ু-চক্র প্রভৃতি অনেক রকমের যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সে যুগে এই ধরনের কোন যন্ত্রের কথা কেউ কল্পনাও করে নি। আর্কিমিডিস্ সে সময়ে উপরে জল তোলবার জন্যে এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করেন। যন্ত্রটা খুবই সরল। একটা সরু, লম্বা রড্—তার গায়ে চওড়া অথচ পাত্‌লা একখানা পাত, স্ক্রুর মত প্যাঁচে আগাগোড়া জড়ানো; অর্থাৎ জিনিষটা চওড়া প্যাঁচওয়ালা লম্বা একটা স্ক্রু। দু-মুখ খোলা একটা লম্বা নলের মধ্যে প্যাঁচওয়ালা লম্বা স্ক্রুটা ঢোকানো আছে। রডের এক মাথায়
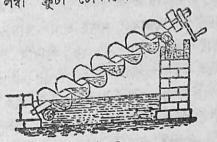
আর্কিমিডিস্ স্ক্রু

নীচ থেকে উপরে জল তোলবার যন্ত্র

একটা হ্যাণ্ডেল আটকানো। হ্যাণ্ডেলের দিকটা উপরে রেখে নলটা হেলানোভাবে জলে বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নীচের জল উপরে

এসে পড়তে থাকবে। চওড়া প্যাঁচওয়ালা এরূপ একটা লম্বা রড যোগাড় করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে; কাজেই এই পরীক্ষাটা করে দেখবার জন্যে তোমাদের আর একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। আশাকরি, এই পরীক্ষাটা তোমরা সবাই করে দেখতে পারবে। কাঠেরই হোক কি বাঁশেরই হোক, বেশ একটু মোটা, লম্বা লাঠির মত একটা জিনিষ যোগাড় কর। লম্বা লাঠির মত জিনিষটার একদিকে একটা হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে নাও। মোটা ছিদ্রওয়ালা একটা রবারের নল স্ক্রুর প্যাঁচের মত করে লাঠির গায়ে জড়িয়ে আটকে দাও। হ্যাণ্ডেলটাকে উপরে রেখে এবার নল-জড়ানো লম্বা দণ্ডটাকে হেলানোভাবে জলের মধ্যে বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নীচের জল উপরে এসে পড়তে থাকবে। ছবিটাকে ভাল করে দেখে নাও—ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে।

জল তোলার পাম্প

১.

পাম্প আর পিচ্‌কিরি প্রায় একই রকমের যন্ত্র। কিন্তু দুটো যন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা সবাই জান—বাঁটটা উপরের দিকে টান্‌লে পিচ্‌কিরির নলটা জলে ভর্তি হয়; আবার বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিলে নলের জলটা সেই মুখ দিয়েই জোরে বেরিয়ে যায়। পাম্পের বাঁটটাও উপরের দিকে টান্‌লে নলটা জলে ভর্তি হয়, কিন্তু বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেললে নলের জলটা উপরের দিক দিয়ে বেড়িয়ে যায়। এজন্যেই নীচ থেকে উপরে জল তোলবার কাজে পাম্পের প্রয়োজন। কিন্তু কি কৌশলে পাম্পের সাহায্যে নীচের জল উপরে তোলা হয়, সে কথা তোমরা সবাই জান কি?

তোমরা নিজেরাই যাতে পরীক্ষা করে দেখতে পার, সে জন্যে একটা

সহজ কৌশলের কথা বলে দিচ্ছি। ছুটো কাচের টেষ্ট টিউব যোগাড় করতে হবে—একটা মোটা আর একটা সরু। সরু টেষ্ট টিউবটা এমন মাপের হওয়া চাই যেন মোটা টেষ্ট টিউবটার মধ্যে বেশ সহজ-ভাবে ঢুকে যেতে পারে। সরু টেষ্ট টিউবটা মোটা টেষ্ট টিউবটার ঠিক গায়ে গায়ে লেগে ঢুকে গেলে বেশ কাজ হবে। এবার ছুটো টেষ্ট টিউবেরই তলায় ছিদ্র করতে হবে। কাজটা খুব শক্ত নয়, গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিলে সে ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই টিউব ছুটোর তলায় ছিদ্র করে দিতে পারে। নচেৎ তোমরা নিজেরাও করে নিতে পার। উপায়টা বলে দিচ্ছি। স্টোভ জ্বালিয়ে টেষ্ট টিউবের তলার দিকটা তার একটা সরু শিখার উপর রাখলেই দেখবে, টিউবের তলাটা লাল হয়ে উঠেছে। আরও একটু গরম কর। কাচটা খুবই নরম হয়ে যাবে। এবার টেষ্ট টিউবের খোলা মুখটা তোমার মুখে লাগিয়ে ফুঁ দাও। সঙ্গে সঙ্গেই তলার দিকটা ফুটো হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবে।
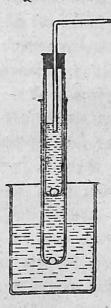
টেষ্ট টিউবের পাম্প

তারপর লাল থাকতে থাকতেই কোন কিছু একটা শক্ত জিনিষ দিয়ে চেপে টিউবের তলার দিকটা সমান করে নাও এবং টিউবটাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দাও। স্টোভের বদলে ব্লো-ল্যাম্প ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। স্যাকরাদের বাঁক-নলের সাহায্যে কাজটা আরও ভালভাবে করা যেতে পারে! এবার সরু টেষ্ট টিউবটার মুখের মাপ মত একটা কর্কের ছিপি যোগাড় কর। ছিপিটার মধ্য দিয়ে একটা সরু ছিদ্র কর। ছিদ্রটার মধ্যে ছু-মুখ খোলা সরু একটা কাচের নল

ঢুকিয়ে দাও। কাচের নলটাকে ছবির মত করে বাঁকিয়ে দিতে হবে। ছিদ্র করা সরু টেষ্ট টিউবটার মধ্যে ছোট্ট একটা সীসার বল বা মার্বেল রেখে নল-পরানো কর্কটাকে তার মুখে বেশ করে এঁটে দাও। ছিদ্রকরা মোটা টেষ্ট টিউবটার তলায়ও একটা সীসার বল বা মার্বেল রাখতে হবে। সরু টেষ্ট টিউবটা যদি মোটা টেষ্ট টিউবটার ভিতরের মাপের সমান হয় তবে তাকে মোটা টেষ্ট টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। যদি ভিতরের টেষ্ট টিউবটা মোটা টেষ্ট টিউবটার চেয়ে অনেকটা সরু হয়, তবে তার মাঝামাঝি জায়গায় সুতা বা ন্যাকড়া জড়িয়ে পিচ্‌কিরির বাঁটের মত করে নিতে হবে। এই হলো তোমার সম্পূর্ণ যন্ত্র। এবার সম্পূর্ণ যন্ত্রটার নীচের দিকের খানিকটা অংশ এক পাত্র জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরে সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে-নীচে ওঠা-নামা করলেই দেখবে পাত্রের জল উপরে উঠে বাঁকানো নলটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে টানলেই দেখবে, পাত্রের জল মোটা টিউবটার ছিদ্রের মুখের মার্বেলটাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকছে। এবার সরু টিউবটাকে নীচের দিকে চাপ দিলেই মার্বেলটা মোটা টিউবের ছিদ্রটাকে বন্ধ করে রাখবার দরুন জল বেরিয়ে যেতে না পেরে সরু টিউবের ভিতরকার মার্বেলটাকে ঠেলে তার ভিতরে ঢুকে যাবে। দ্বিতীয় বার টেনে আবার চাপ দিলেই বাড়তি জলটা বাঁকানো নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। মার্বেল দুটো জল ঢোকবার ও বেরিয়ে যাবার পথে কপাট বা ভাল্‌ভের কাজ করে। ছবিটা ভাল করে দেখে নিলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারবে।

২০

এবার সত্যিকার কাজ চালাবার মত আসল পাম্প তৈরি করবার ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি। যদি তোমাদের উৎসাহ থাকে, তবে একটু চেষ্টা করে অনায়াসে কাজ চালাবার মত একটা ফোর্স-পাম্প তৈরি করে নিতে পার। ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য কর। এই ছবিটাতে একটা পাম্পেরই ১, ২, ৩ করে বিভিন্ন কার্যপন্থা দেখানো হয়েছে। একটা

লোহা বা পিতলের মোটা চোঙের নীচের দিকে গ-চিহ্নিত একটা পাইপ লাগানো আছে। পাইপটার শেষপ্রান্ত নীচু জায়গায় কোন পুকুর বা চৌবাচ্চার জলে ডুবনো থাকবে। চোঙটার উপরের দিকে এক পাশে রয়েছে জলের কলের মত একটা খোলা-মুখ নল। উপরে পিচ্‌কিরির বাঁটের মত একটা লম্বা বাঁট। বাঁটের নীচের প্রান্তে এঁটে দেওয়া হয়েছে বেশ পুরু একখানা চাক্‌তি। চাক্‌তিটার মধ্যস্থলে বেশ মোটা একটা ছিদ্র। ছিদ্রটার উপরে খ-চিহ্নিত পুরু এক টুক্‌রো চামড়া এক পাশে আঁটা রয়েছে। এক পাশে আঁটা থাকবার দরুন চামড়াটা কব্জা-আঁটা ডালার মত একটু উঁচু অথবা নীচু হতে পারে। চোঙের নীচের দিকে গ-চিহ্নিত নলটার মুখেও ক-চিহ্নিত এক টুক্‌রো পুরু চামড়া কব্জার মত আঁটা রয়েছে।

১ নম্বরে, বাঁটটাকে উপরের দিকে টানা হয়েছে। ফলে, খ-চিহ্নিত চামড়ার ডালাটা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ক-চিহ্নিত চামড়ার ডালাখানাকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে পুকুরের জল গ-

ফোর্স-পাম্পের কার্যপন্থা দেখানো হয়েছে
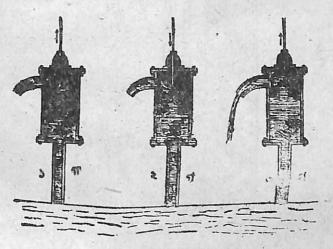
চিহ্নিত নল দিয়ে চোঙের মধ্যে ঢুকছে। ২ নম্বরে, বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ক-চিহ্নিত চামড়ার ডালাখানা নলের

মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং খ-চিহ্নিত ডালাখানাকে খুলে জল উপরে উঠে যাচ্ছে। ৩ নম্বরে, বাঁটটাকে পুনরায় উপরের দিকে টানা হচ্ছে। ফলে চাক্তির উপরের জলটা পাশের নল দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে। চামড়ার ডালার বদলে বড় মার্বেলও ব্যবহার করতে পার। কোন রকমে টিউবওয়েলের পাম্প বা ষ্টিরাপ পাম্প খোলা অবস্থায় দেখতে পারলে ব্যাপারটা আরও সহজে বুঝতে পারবে।

দড়ির সাহায্যে জল তোলা

পাম্পের সাহায্যে উপরে জল তোলা হয়, একথা তোমরা সবাই জান। কিন্তু পাম্প ছাড়াও যে দু-গাছা দড়ির সাহায্যে উপরে জল
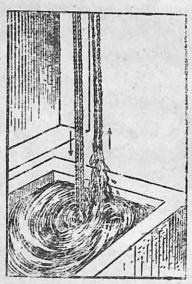
দড়ির সাহায্যে জল তোলা

তোলা যায়, সেটা তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দেখতে পার ধর, ২৫ ফুট উঁচুতে ছোট একটা মোটর বসানো হয়েছে। মোটরের

পুলির সঙ্গে দু-গাছা মাঝারি গোছের মোটা দড়ি বেল্টিং-এর মত করে নিচের জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে। দড়ি দু-গাছার যে অংশ ট্যাঙ্কের জলে ডুবনো থাকবে সেখানেও একটা পুলি ঝুলিয়ে দাও। কাঠের সাধারণ পুলি হলেই চলবে। নিচের পুলিটার কেন্দ্রের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সরু তার গলিয়ে একটা কিছু ভার ঝুলিয়ে দিতে হবে। লোহার একটা চাকা পুলির মত করে ব্যবহার করলে আর অতিরিক্ত ভার ঝোলাবার দরকার হবে না ; পুলির ভারেই দড়ি টান হয়ে থাকবে। মোটর চালিয়ে দিলেই দড়ি দু-গাছা বেল্টিং-এর মত ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির ফাঁকে জল উপরে উঠে উপরের পুলির তলায় রক্ষিত পাত্রে জমা হবে। এভাবে মিনিটে প্রায় ১২ গ্যালন জল ২৫ ফুট উপরে তোলা যেতে পারে। পাম্পের চেয়ে এই ব্যবস্থায় জল তোলা যে কত সহজ, পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে। যেখানে মোটর চালাবার সুবিধা নেই, সেখানে বায়ু-চক্রের সাহায্যেও অতি সামান্য খরচায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে উপরে জল তোলা যেতে পারে।

সহজ কৌশলে জলের কল

এর আগে তোমাদের সহজ কৌশলে উপরে জল তোলবার জন্যে আর্কিমিডিস স্ক্রুর কথা বলেছি। এবার সে যন্ত্রেরই আরও কিছু উন্নত ধরনের ব্যবস্থার কথা বলছি। এই যন্ত্রটাও তোমরা অনায়াসে তৈরি করতে পার। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ছবি থেকেই যন্ত্রের কৌশল বুঝতে পারা যাবে।

প্রথমে ডানদিকের মাথা বাঁকানো খাড়া নলটার মত একটা

লোহা বা পিতলের পাইপ যোগাড় কর। ওই পাইপটার গোড়ার দিকে, সাধারণ জলের কলের মুখের মত, মাঝের গোল জায়গাটায়
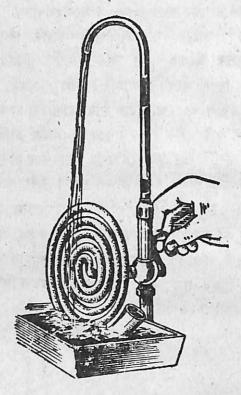
একটা ট্যাপ জুড়ে দিতে হবে। এই গোল অংশটার ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা অথচ সরু একখণ্ড পাইপের টুক্‌রো ঢুকিয়ে তার এক মুখ বন্ধ করে অপর মুখ খোলা রেখে দাও। এই ছোট্ট পাইপের টুক্‌রোটা, খাড়া পাইপটার গোলাকার স্ফীত স্থানটার ভিতর দিয়ে এমনভাবে বসাতে হবে যে, তার কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না অথচ বেশ সহজভাবে ঘুরতে পারবে। এই টুক্‌রো পাইপের যে অংশটুকু খাড়া পাইপটার স্ফীত অংশের ভিতরে থাকবে, সেখানে তার গায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় চারটি মোটা ছিদ্র করে দিতে হবে। টুক্‌রো পাইপটার বন্ধ মুখে একটা হ্যাণ্ডেল জুড়ে দাও। হ্যাণ্ডেল ঘোরালে

এই ছোট্ট পাইপটাও ঘুরবে। এবার একটা রবারের নল যোগাড় করে সেটাকে ছবির নলের মত কুণ্ডলী করে তার ভিতরের দিকের মুখটা ওই ছোট্ট পাইপটার খোলা মুখে এঁটে বসিয়ে দাও। নলের কুণ্ডলীটাকে ঠিকভাবে রাখবার জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। রবারের নলের কুণ্ডলীর পরিবর্তে ধাতুনির্মিত নলও ব্যবহার করতে পার। যন্ত্রটাকে সুবিধামত জায়গায় এমনভাবে বসাও যেন নলের কুণ্ডলীটার কিছুটা জলে ডুবে থাকে। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নলের কুণ্ডলীটাও ঘুরতে থাকবে। হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে নলের কুণ্ডলীটাকে সামনের দিকে ঘোরাতে থাকলে জল কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে খাড়া পাইপের পথে উপরে গিয়ে পড়তে থাকবে।

উপর থেকে জলের নীচে দেখবার কৌশল

উপর থেকে খুব পরিষ্কার অগভীর জলের তলা অবধি দেখা যেতে
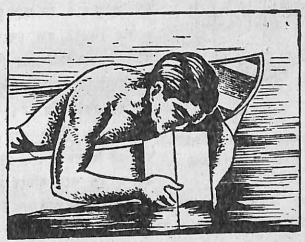
১নং ছবি

উপর থেকে জলের নীচে দেখবার ব্যবস্থা

পারে। কিন্তু একটু বেশী গভীরতায় বা অপরিষ্কার জলের নীচে থেকে কিছুই দেখা যায় না। উপর থেকে জলের নীচে যাতে সব কিছু

পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে, এমন একটা সহজ কৌশলের কথা বলছি। ইচ্ছা করলে তোমরা অতি সহজে এই জিনিসটা তৈরি করে জলের নীচে মাছের গতিবিধি এবং জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে পার। জিনিসটা বিশেষ কিছুই নয়—খুব পাত্‌লা কাঠের লম্বা একটা চৌকো বাক্স মাত্র। লম্বা বাক্সটার তলার দিকে একখানা চৌকো কাচ আঁটা। আর উপরের দিকে থাকবে খাটো একটা ডিম্বাকৃতি চোঙ, যার ভিতর দিয়ে এক সঙ্গে দু-চোখে দেখতে পারা যায়।

২নং ছবি
বাক্সটা কেমন করে তৈরি করতে হবে, তার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে

শিরিষের আঠা দিয়ে পাত্‌লা কাঠ জুড়ে লম্বাটে একটা বাক্স তৈরি কর। ২নং ছবির মত করে নীচের দিকে একখানা কাচ এমন ভাবে জুড়ে দাও যেন জলে ডুবিয়ে ধরলেও ভিতরে জল ঢুকতে না পারে। বাক্সের উপরের দিকের কাঠখানায় ডিমের মত গোল করে বেশ বড় একটা ছিদ্র কর। তারপর একখানা টিনের পাত গোল করে ওই ছিদ্রের মুখে একটু উঁচু কানার মত করে বসিয়ে দাও। টিনের এই উঁচু কানাটায় চোখ রেখে দেখবার জন্যে পাত্‌টার উপরের ধারে একটু পুরুভাবে কাপড় বা রবারের প্যাড দিয়ে মুড়ে দিতে হবে এবার ১নং ছবিতে যেমন আছে, তেমনি ভাবে বাক্সটাকে জলের নীচে অর্ধেকটা ডুবিয়ে রেখে চোঙটাতে চোখ লাগিয়ে জলের তলায় দেখতে হবে।

ডুবুরি নল

যারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডুব-সাঁতার কাটতে চাও বা জলের খানিকটা নিচে ডুবে থাকতে চাও, তারা ছবির মত এক রকমের চোঙ বা নল ব্যবহার করতে পার। জলে ডুবে থেকেও স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের হাল্কা নলের সাহায্যে অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালানো যেতে পারে। ছবিটি লক্ষ করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। বাঁকানো নলটার নীচের
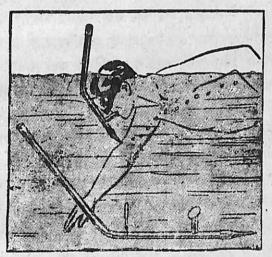
উপরে—ডুবুরি নল ব্যবহারের কৌশল দেখানো হয়েছে;
নীচে—ডুবুরি নল

বাহুর এক পাশ থেকে ছোট্ট আর একটা নল বেরিয়েছে। ফিতা দিয়ে নলটা মাথার সঙ্গে আট্‌কে রেখে পাশের ছোট নলটাকে মুখে রাখতে হবে। নলের নীচের প্রান্তে বাইরের দিকে একটা ভাল্‌ভ এবং উপরের প্রান্তে ভিতর দিকে একটা ভাল্‌ভ আছে। নলের উপরের দিকটা জল ছেড়েও বেশ খানিকটা উপরে থাকবে। শ্বাস নেবার সময় উপর থেকে মুখের মধ্যে বাতাস ঢুকবে—আর নলের

নীচের মুখ দিয়ে প্রশ্বাসের বাতাস বেরিয়ে যাবে। প্লাষ্টিকের নল যোগাড় করে তোমরা এটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অ্যালুমিনিয়ামের উপর ক্রমবর্ধমান ছত্রাকের মত পদার্থ

জীবন্ত না হয়েও দানা বাঁধবার সময় কতকগুলি পদার্থ যে সজীব বস্তুর মত বেড়ে ওঠে, তার একটা পরীক্ষার কথা বলছি।

যে কোন রকমের এক টুক্‌রো অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করে তাকে শিরিষ কাগজ দিয়ে বেশ করে ঘষে পরিষ্কার করে নাও। টুক্‌রোটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তার উপর দু-এক ফোঁটা পারা (Mercury) ঘষে দাও। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে অ্যালুমিনিয়াম টুক্‌রোর যেখানে যেখানে ভাল ভাবে পারা লেগেছে, সে সব জায়গা থেকে

পারা-সংযোগে অ্যালুমিনিয়াম পাতের উপর ছত্রাকারের মত পদার্থ গজিয়ে উঠছে

কোমল পশমের মত সাদা একরকম পদার্থ বেরিয়ে আসছে। চোখের সামনেই দেখতে দেখতে সেগুলি ক্রমশ লম্বায় বেড়ে যাবে। কোন কোনটা আধ ইঞ্চিরও বেশী বড় হয়ে উঠবে। আসলে জীবন্ত না হলেও এই বাড়ন্ত পদার্থগুলিকে এক রকম ব্যাঙের ছাতার মত সজীব উদ্ভিদ বলেই মনে হবে।

গাছের পাতায় ফটোগ্রাফী

কাগজের উপর যেমন ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয়, গাছের পাতার উপরেও ঠিক তেমনি করে ছবি তোলা যেতে পারে তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু উপায়টা বলে দিচ্ছি—ধৈর্য ধরে একটু চেষ্টা করে দেখো, সবাই একাজে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

যে-কোন রকম হাতে-আঁকা ছবি, হাতের লেখা বা ফটোগ্রাফের ছবি গাছের পাতার উপর তুলতে হবে। গাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার দরকার নেই, গাছের গায়ে পাতা যেমনি আছে তেমনি থাকবে। তোমরা হয়তো ভাবছ—পেন্সিল, কালি-কলম বা তুলি দিয়ে পাতার উপর ছবি তোলবার কথা বলছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। কাগজের উপর যেমন করে নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয়, পাতার উপরও ঠিক সেই রকমেই ছবি ফুটে উঠবে। এতে কালি, কলম বা রং-তুলির প্রয়োজন নেই। কেমন করে ছবি তুলতে হবে বলছি—

যে সব গাছের পাতা মসৃণ—প্রথম পরীক্ষার সময় সে সব গাছই বেছে নেবে। কারণ প্রথমেই খস্‌খসে বা উঁচু শিরা তোলা পাতা নিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। এজন্যে প্রথমে গুঁড়ি কচুর পাতা, ক্যানা-ফুল বা ট্রপিউলাম প্রভৃতির পাতা বেছে নিতে হবে। তাছাড়া ছবি তোলবার জন্যে এমন জায়গার পাতাই বেছে নেওয়া দরকার, যেগুলি সারা দিনই কিছু না কিছু আলো পায়। আবার খুব কড়া রোদ হলেও প্রথম প্রথম সুবিধা করতে পারবে না। এখন ছোট ছোট দুখানা সাদা কাচ সংগ্রহ করে বেশ পরিষ্কার করে নেবে। কাচ দুখানা চার ইঞ্চি চৌকো বা তার চেয়ে ছোট হলেও চলবে। একখানা কাচের উপর চাইনিজ ইঙ্ক বা ওই রকমের কোন ঘন কালো কালি দিয়ে যে কোন রকম ছবি আঁক বা নাম সই কর। কিছুক্ষণ রোদে রাখলেই

কালিতে আঁকা ছবি বা লেখাটা শুকিয়ে যাবে। যে পাতাটার উপর ছবি বা তোমার নাম তোলবার ইচ্ছা, সে পাতাটার উপর নাম সই-করা বা ছবি-আঁকা কাচখানা চাপা দাও। আঁকা দিকটা উপরে থাকবে। অপর সাদা কাচখানাকে পাতাটার নীচে রেখে কাঠের ছোট ছোট ক্লিপ দিয়ে পাতাসমেত উপর ও নীচের কাচ দুখানা এমনভাবে চেপে রাখ যেন উপরের কাচ ও পাতার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে, অথচ পাতাটাও জখম না হয়। কাচের ভারে পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না পড়ে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা রোদ পাবার পর কাচ দুখানা খুলে ফেললেই দেখবে—পাতার গায়ে তোমার আঁকা ছবি বা নাম অবিকল ফুটে উঠেছে।
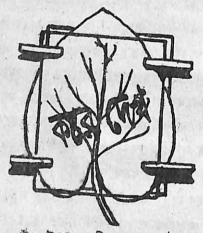
পাতাটার উপরে ও নীচে দুখানা চৌকো কাচ কাঠের ক্লিপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। উপরের কাচখানার উপরের দিকে চাইনিজ-ইঙ্ক দিয়ে 'করে দেখ' লেখা রয়েছে

কোন্ পাতায় কতক্ষণ রোদ লাগানো দরকার সেটা তোমরা পরীক্ষা করে ঠিক করে নেবে। কোন কোন অবস্থায় হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি ফুটে উঠবে; কোনটাতে আবার একদিন-দুদিনও লাগতে পারে। ফটোগ্রাফের যে কোন একখানা নেগেটিভ এভাবে

পাতার উপর চাপিয়ে দিলেও দেখবে, ফটোগ্রাফের ছবিটি পাতার উপর ফুটে উঠেছে। কিন্তু লক্ষ রাখবে, রোদ খুব কড়া না হয়। কড়া রোদে কাচ তেতে গিয়ে পাতাটাকে ঝল্‌সে দিতে পারে। কাচ ছাড়া যে কোন স্বচ্ছ জিনিসে ছবি এঁকেও এভাবে পাতার গায়ে তার ছাপ তোলা যেতে পারে। একটু পুরু কালো কাগজে নক্সা কেটে নিয়ে তাকে পাতার উপর বসিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ রোদ পাবার পর হুবহু সেই নক্সা পাতার গায়ে ফুটে উঠবে।

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে মোটামুটি একটু বুঝিয়ে বলছি। ঘাসের উপর ইট বা কোন কিছু পদার্থ চেপে থাকলে কিছুকাল পরে তুলে ফেললে দেখা যায়—চাপা-পড়া ঘাসগুলি সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে তার মানে, রোদ না পেলে গাছের পাতার সবুজ রঙটা তৈরি হয় না। কাচের গায়ে কালো কালিতে ছবি আঁকার ফলে কালির রেখাগুলির ভিতর দিয়ে পাতার গায়ে রোদ পড়তে পারে না। কাজেই যে জায়গাটায় রোদ পড়ে, সেটা বেশ সবুজই থাকে কিন্তু রোদ না-পাওয়া জায়গাগুলি ক্রমশ ফ্যাকাসে হতে থাকে। এ-কারণেই সবুজ পাতার উপর ফ্যাকাসে বা ফিকে সবুজ রঙের ছবি দেখা যায়।

আয়োডিন সলিউশনে ডুবিয়ে অবশ্য এই ছবিগুলিকে ফটোগ্রাফের ছবির মত স্থায়ী করা যায়; কিন্তু তাতে পাতাটাকে জীবন্ত অবস্থায় রাখা চলে না। অবশ্য অতটা না করেও তোমরা সোজাসুজি পাতার গায়ে ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলবার পরীক্ষাটা করে দেখতে পার।

ডুবুরি মাছ

তোমরা লক্ষ করে থাকবে—অনেক মাছেরই পেটের ভিতরে শিরদাঁড়ার নীচে বাতাসভর্তি একরকম পট্‌কা থাকে। ইংরেজীতে এটাকে বলে—'সুইমিং ব্লাডার'। মাছ তার পেশীর সাহায্যে এই

পট্‌কাকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে ইচ্ছামত ডুবে যেতে পারে অথবা ভেসে থাকতে পারে। খুব সহজ একটা পরীক্ষায় তোমরা এই ধরনের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার।

বড় মার্বেলের মত একটা ফাঁপা কাচের বল যোগাড় কর। গ্লাস-ব্লোয়ারদের কাছে এ রকমের অনেক বাতিল কাচের বল পাবে। অথবা তাদের দিয়ে অনায়াসেই এরকমের একটা ফাঁপা বল তৈরি করে নিতে পার। বলটার তলার দিকে বোঁটার মত একটু অংশ থাকবে। ওই বোঁটার পাশে, অর্থাৎ বলের নীচের দিকে ছোট্ট একটা ফুটো রাখতে হবে। কাচ দিয়েই হোক বা প্লাস্টেসিন দিয়েই হোক, ছোট্ট একটা মাছ তৈরি করে কাচের বলটার বোঁটার সঙ্গে ছবির মত করে জুড়ে দাও। এছাড়া একটা কাচের গ্যাস-জার অথবা মোটা টেস্ট টিউব যোগাড় করতে হবে। গ্যাস-জার বা টেস্ট টিউব না পেলে মোটা-মুখ, খাটো গলাওয়ালা বোতলেও কাজ চলবে। বোতলে অথবা গ্যাস-জারের প্রায় গলা অবধি জল ভর্তি করে তাতে কাচের বল সংলগ্ন মাছটাকে ছেড়ে দাও। ফাঁপা বলটা জলের উপরে অনেকটা ভেসে থাকবে। ড্রপারের সাহায্যেই হোক, কি জলের কলের নীচে ধরেই হোক—বোঁটার পাশের ফুটোর ভিতর দিয়ে বলটার মধ্যে খানিকটা জল ভর্তি করে আবার সেটাকে জলে ছেড়ে দাও। যদি জল বেশী ভর্তি হয়ে থাকে তবে মাছ সমেত বলটা এবার ডুবে গিয়ে জলের তলায় চলে যাবে। ডুবে গেলে ঝাঁকুনি দিয়ে বল থেকে খানিকটা জল বের করে এমন অবস্থায় আনবে যাতে বলটা জলের উপর সামান্য একটু মাত্র ভেসে থাকে। বোতল বা জারের মুখে এবার একটা রবারের পাত বেঁধে বা রবারের ছিপি এঁটে দিয়ে তাতে জোর করে একটু চাপ দিলেই দেখবে—বল-সংলগ্ন ভাসমান মাছটা জলের তলায় ডুবে যাবে। চাপ ছেড়ে দিলেই মাছটা আবার জলের উপর ভেসে উঠবে! ছিপির উপর চাপ দিলে বোতলের বাতাসের উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে খানিকটা জল ফুটো দিয়ে ফাঁপা বলটার

ভিতরে ঢুকে যায়। জল ঢোকবার ফলে বলটা আগের চেয়ে খানিকটা ভারী হয় বলেই জলের নীচে তলিয়ে যায়। চাপ ছেড়ে দিলেই সেই জলটুকু আবার বেরিয়ে আসে এবং মাছসমেত বলটাও জলের উপর ভেসে ওঠে।

কাচের টিউবটাকে কেমন করে আঙুলে চেপে ধরতে হবে, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে

তোমার বন্ধুদের কাছে পরীক্ষাটা দেখাবার সময় মাছটাকে ডুবতে বললেই ডুবে যাবে ; আবার ভাসতে বললেই ভেসে উঠবে এই সঙ্গে দেওয়া ছবির মত ব্যবস্থায় জিনিসটাকে করে দেখো— অজানা লোকেরা দেখে ভাববে—মাছটা যেন তোমার কথামতই ওঠানামা করছে !

ঘূর্ণায়মান জলচক্র

এই পরীক্ষাটা খুবই সহজ। এর উপকরণ সংগ্রহ করতে তোমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। একটু মনোযোগ দিয়ে

দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে প্রত্যেকেই আশ্চর্য রকম সফলতা লাভ করবে।

প্রথমে একখণ্ড সোলা বা কর্ক এবং চাপ-দেওয়া কর্পূরের চৌকো টুকরো সংগ্রহ করতে হবে। সোলার গাছ হয়—সাধারণ একটা লাঠির মত মোটা। ভিতরে আগাগোড়া একটা সরু ছিদ্র আছে। এক এক চাক সোলা হলেই চলবে। ছিপির কর্ক নিলে তার মধ্যস্থলে একটা ফুটো করে নিতে হবে। চাপ-দেওয়া কর্পূরের চৌকো ব্লক বা তার টুকরো যে কোন দোকানেই কিনতে পাওয়া যাবে। এই ধরনের কর্পূরের টুকরো পেলেই ভাল হয়, নচেৎ ডেলা কর্পূরেও কাজ চলতে
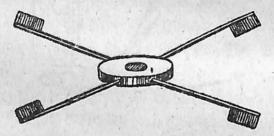
সোলার চাক্‌তির গায়ে বসানো কাঠির মাথার
একদিক করে কর্পূরের টুক্‌রো এঁটে দেওয়া হয়েছে

পারে। অবশ্য এই সকল পরীক্ষার বেশীর ভাগই তোমাদের বুদ্ধি-কৌশল এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে। পাঁচ-ছটা পয়সা এক থাকে সাজিয়ে রাখলে যতটা পুরু হয় ততটা পুরু করে এক চাক সোলা খুব ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নাও। একটা দেশলাইয়ের কাঠি লম্বালম্বি চার ভাগে চিরলে চারখানা খুব সরু কাঠি হবে। দেশলাইয়ের কাঠির বদলে ওই রকমের সরু চারখানা বাঁশের চোঁচ অথবা সূচ বা অন্য যা কিছু একটা হলেই কাজ চলবে। ওই রকম চারখানা কাঠির একমুখ ছুঁচলো করে নিয়ে সোলার চাকতিটার গায়ে চারদিকে সমান দূরে দূরে বেশ একটু শক্ত করে বসিয়ে দাও। সোলার চাক্‌তি যতটা পুরু করে কেটেছ, ঠিক ওই রকম পুরু আর চারখানা

সোলার ছোট্ট চৌকো কেটে নিয়ে চাক্‌তিটার গায়ে বসানো কাঠির মাথায় ঢুকিয়ে বসিয়ে দাও। জিনিসটা দেখতে একটা চর্কির মত হবে। এবার কর্পূরের ব্লক থেকে ছোট্ট চারখানা লম্বাটে বা চৌকো টুকরো কেটে বের কর। সহজে জলে গলে না যায়, এরূপ সামান্য একটু ভালো আঠা দিয়েই হোক বা পাত্‌লা করে মোম লাগিয়েই হোক, কর্পূরের চ্যাপ্টা টুক্‌রোগুলিকে কাঠির মাথায় আটকানো সোলার
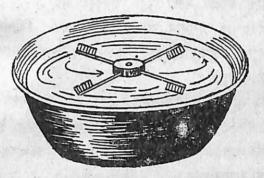
গামলার জলে সোলার চর্কিটা ঘুরছে

টুক্‌রোর গায়ে একদিক করে এঁটে দাও। কর্পূরের টুক্‌রোগুলি যেন একটায় এধারে, আর একটায় ওধারে লাগানো না হয়। বাঁদিক ধরেই হোক কি ডান-দিক ধরেই হোক, কর্পূরের ফালিগুলি সোলার চর্কিটার চারটে বাহুতে একদিক করে লাগাতে হবে। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও তবেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। সোলার চর্কিটাকে যতদূর সম্ভব হাল্কা আর চারদিক সমভার করবার জন্যে বিশেষ নজর রাখবে। এবার হয় একটা বড় গামলা, না হয় চৌবাচ্চা বা পুকুরের জলের উপর চর্কিটাকে আস্তে ছেড়ে দাও। দেখবে, হাওয়ায়-ঘোরা চর্কির মত এই চর্কিটাও জলের উপর পাক খেয়ে ঘুরতে শুরু করেছে এবং অনেকক্ষণ ধরে অনবরত ঘুরতেই থাকবে। কর্পূরের পরিবর্তে ভাল সাবান দিয়েও এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। গামলার তলায় জলের নীচে মোম বা প্ল্যাস্টেসিন দিয়ে একটা সরু কাঠি বসিয়ে দাও

কাঠিটা যেন জলের উপর খানিকটা বেরিয়ে থাকে। সোলার ফুটোর মধ্যে দিয়ে ওই কাঠিটা গলিয়ে দিলে এক জায়গায় থেকেই চর্কিটা চাকার মত ঘুরতে থাকবে।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। জলের উপর কর্পূরের গুঁড়া বা পাত্‌লা এক টুকরো সাবান অথবা এক ফোঁটা তেল ছড়িয়ে দিয়ে দেখো, ব্যাপারটা কি হয়। কর্পূর বা সাবান থেকে কোন পদার্থ যেন ভয়ানক বেগে জলের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে—দেখতে পাবে। কর্পূরের টুকরো যদি ভাসমান সোলার সঙ্গে এরূপ বিশেষ কৌশলে আটকানো থাকে, তবে চারদিকের চারটি বাহুর উপর সমবেত ধাক্কায় চর্কিটা ঘুরতে থাকবেই।

যদি কেউ বুদ্ধি করে জিনিসটাকে বেশ একটু বড় অথচ হাল্কা করে নিখুঁতভাবে তৈরি করতে পার, তবে প্রত্যেক বাহুর উপর হাল্কা কাগজের ছবি কেটে দাঁড় করিয়ে বা অন্য অনেক উপায়ে চিত্তাকর্ষক খেলার ব্যবস্থা করতে পার।

ধোঁয়ার অঙ্গুরী

একটা টিনের কৌটো যোগাড় কর। কৌটোর তলার দিকটায় প্রায় আধ ইঞ্চি গোলাকার পরিষ্কার একটা ছিদ্র করতে হবে, অর্থাৎ গোলের
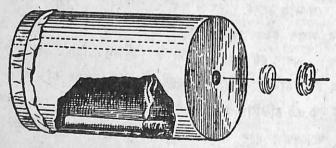
টিনের কৌটোর তলার ছিদ্র, কাগজ মোড়বার কায়দা এবং জলন্ত সিগারেট রাখবার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে

ধারটা যেন মসৃণ হয়। কৌটোটাকে বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে খোলা মুখটাতে শক্ত একখণ্ড পাত্‌লা কাগজ মুড়ে কৌটোর গায়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দাও। জ্বলন্ত একটা সিগারেটের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ফেলে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌটোটা ধোঁয়ায় ভরে উঠবে। এবার ঢাকনা কাগজখানার উপর একটু একটু করে চাপ দিলে বা আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক-একটা করে ধোঁয়ার অঙ্গুরী বেরিয়ে আসবে।

দেশলাই-বন্দুক

ছু-চারটা দেশলাই কাঠির বারুদের বিপরীত দিকটা, পিন দিয়ে একটা কর্কের পিছন দিকে এঁটে দাও। কর্কটাকে একটা বোতলের মুখে এঁটে দিলে দেশলাইয়ের কাঠিগুলি থাকবে বোতলের মধ্যে। বোতলটাকে শুইয়ে রেখে বাইরে থেকে একটা রিডিং-গ্লাস সূর্যের আলোয় এমনভাবে
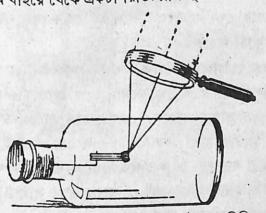
বোতলের মধ্যে দেশলাইয়ের কাঠি রেখে রিডিং গ্লাসের ভিতর দিয়ে আলো ফেলা হচ্ছে

ধর যেন সংহত আলোক-বিম্বটা গিয়ে কাঠির বারুদের উপর পড়ে আলোক-বিম্বটা পড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঠিগুলিতে আগুন ধরে

যাবে। আগুনের উত্তাপে ভিতরের আবদ্ধ বাতাস প্রসারিত হবার ফলে বন্দুকের মত আওয়াজ করে বোতলের মুখের কর্কটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

কাগজের চলন্ত মাছ

সহজ একটা মজার পরীক্ষার কথা শোন। এই পরীক্ষাটা তোমরা প্রত্যেকে অনায়াসেই করতে পারবে। পোস্টকার্ডের মত পুরু এবং মসৃণ একখণ্ড কাগজ নাও। কাঁচি দিয়ে কেটে একটা মাছের মত তৈরি কর। মাছটার শরীরের প্রায় মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্রটা পেন্সিলের মত মোটা হলেই চলবে। এবার মাছটার লেজের মধ্য দিয়ে গোলাকার ছিদ্রটা পর্যন্ত সোজাসুজি খানিকটা ফাঁক করে সরু এক ফালি কাগজ কেটে ফেলে দাও। মাছটাকে এখন দেখে মনে হবে যেন মধ্যস্থলের গোল গর্ত থেকে লেজ পর্যন্ত সোজা একটা নালা কাটা হয়েছে।

কোন বড় চৌবাচ্চায়ই হোক বা কোন পুকুরেই হোক কাগজের মাছটাকে এবার আস্তে আস্তে জলের উপর ছেড়ে দাও। মাছটা জলের উপর বেশ ভাসতে থাকবে। এবার একটা কাঠির ডগায় করে গোলাকার ছিদ্রটার মধ্যে এক ফোঁটা তেল ছেড়ে দিলেই দেখবে— কাগজের মাছটা সামনের দিকে চলতে শুরু করেছে। লক্ষ রেখ— জলটা বেশ পরিষ্কার হওয়া চাই। জলের উপর সামান্য সরের মত পদার্থ থাকলেও পরীক্ষায় ফল হবে না। যদি চৌবাচ্চার জলের পরীক্ষা করতে চাও, তবে প্রথমবার পরীক্ষার পর চৌবাচ্চার জলের উপর তেল ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে তুলে না ফেলা পর্যন্ত সেখানে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করা মুশ্‌কিল হবে। কাজেই পুকুরের জলে বা

ট্রের মত কোন অগভীর পাত্রে জল রেখে পরীক্ষা করাই ভাল। ট্রের জলে একবার তেল ছড়িয়ে পড়লে তা ফেলে দিয়ে আবার জল ভর্তি করে পরীক্ষা করা চলে।

কেন এমন হয়? পরীক্ষাটা করে দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে। জলের উপর এক ফোঁটা তেল ফেলে দিলে দেখবে, সেটা তৎক্ষণাৎ পাত্‌লা সরের মত ছড়িয়ে পড়ে। কাগজের গোলাকার ছিদ্রটা খুব ছোট্ট জায়গা। তেলটা এখানে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা না পেয়ে নালার মত লম্বা ফাঁক দিয়ে সোজা লেজের দিকে বেরিয়ে যায়। সেই ধাক্কায় কাগজের মাছটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

আজকাল তোমরা যে রকেট বা জেট-প্রোপেল্‌ড্‌ এরোপ্লেনের

কাগজের মাছ

কথা শুনতে পাও, সেগুলি ঠিক এমনি করেই গ্যাসের ধাক্কায় প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে। উভয়েরই চলবার মূল রহস্য এক, পার্থক্য কেবল শক্তির তারতম্যে। আরও বড় হয়ে যখন এই বিষয়ে আলোচনা করবে, তখন একথা ভাল করে বুঝতে পারবে।

পল্‌তে-শূন্য বাতি

লোহা কঠিন পদার্থ হলেও উপযুক্ত উত্তাপ প্রয়োগে তরল হয়ে যায়। আবার তেল, জল প্রভৃতি তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয়ে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়! কেরোসিন তেলে পল্‌তে ডুবিয়ে আমরা আলো জ্বালি, কিন্তু সেই তরল কেরোসিনকে উত্তাপ প্রয়োগে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করলে পল্‌তে ছাড়াই তাতে আলো জ্বালানো চলে। কেরোসিন স্টোভ জ্বলবার কারণই এই। পল্‌তের সাহায্যে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। কিন্তু

পল্‌তে-শূন্য স্পিরিট বাতির নমুনা

পল্‌তে ছাড়াও সহজেই মেথিলেটেড স্পিরিটের আলো জ্বালানো চলে। এটা তোমরা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। তবে খুব সাবধানে করবে, কারণ এতে খুব সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে।

সাধারণ একটা টেস্ট টিউব সংগ্রহ কর। টেস্ট টিউবটার মুখে বেশ আঁট হয়ে বসতে পারে, এমন একটা কর্কের মধ্যে ছিদ্র করে

তাতে সরু একটা কাচের নল বসিয়ে দাও। কর্কের নীচে কাচের নলটার সামান্যই যেন বেরিয়ে থাকে। টেস্ট টিউবটার মধ্যে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ভর্তি করে কাচের নলসমেত কর্কটা এঁটে বসিয়ে দাও। এই অবস্থায় টেস্ট টিউবটাকে ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে বসিয়ে দিলেই কাচের নলের ভিতর দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসতে স্বুরু করবে। এবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিলেই নলের মুখে বাতি জ্বলতে থাকবে।

চামচ থেকে শ্রুতিমধুর শব্দ

একখানা বড় চামচ সংগ্রহ কর। হাতলের মধ্যস্থলে সমান দৈর্ঘ্যের

চামচটাকে ঝুলিয়ে কেমন করে আঙ্গুল কানে চেপে ধরতে হবে, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে

লম্বা দু-গাছা স্বুতোয় গেরো বেঁধে চামচখানাকে ঝুলিয়ে দাও। স্বুতো

দু-গাছার অপর প্রান্তে দুটো ফাঁস তৈরি কর। ফাঁস দুটোর ভিতর দিয়ে দু-হাতের দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে কানের ছিদ্রের উপর চেপে ধর। এবার চামচটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে চেয়ার অথবা টেবিলের গায়ে ঠেকালেই সুমিষ্ট আওয়াজ শুনতে পাবে। কি রকম করে করতে হবে ছবি দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে।

টাট্‌কা ডিম কি জলে ভাসে ?

ভূগোলে নিশ্চয়ই তোমরা 'ডেড্-সি'র কথা পড়েছ। 'ডেড্-সি' একটা প্রকাণ্ড হ্রদ। সাঁতার না জেনে জলে নামলে ডুবে মরতে হয় —একথা কাউকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু সাঁতার না জেনেও জলে ডুবতে হয় না, এমন বিস্ময়কর জলাশয়ও পৃথিবীতে রয়েছে। 'ডেড্-সি'ই এরকমের প্রকাণ্ড একটা জলাশয়। সাঁতার জানে না, এমন কেউ 'ডেড্-সি'র জলে পড়ে গেলেও তার ডুবে মরবার আশঙ্কা নেই—সোলার মত সে জলের উপরেই ভেসে থাকবে।

কেন এমন হয়, বলতে পার ? সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে হাল্‌কা বলে সোলা জলে ভাসে ; কিন্তু সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে মানুষের শরীর ভারী—কাজেই মানুষ জলে ডুবে যায়। 'ডেড্-সি'র জলের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র ! 'ডেড্-সি'র জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সে জন্যে সাধারণ পরিষ্কার জলের চেয়ে 'ডেড্-সি'র জলের ঘনত্ব অনেক বেশী। কাজেই সম-আয়তনের জলের চেয়ে হাল্‌কা হওয়ায় মানুষ 'ডেড্-সি'র জলের উপর ভেসে থাকে। ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে বোঝবার জন্যে খুব সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। দুটো কাচের গ্লাস নাও। একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পরিষ্কার জলে ভর্তি কর। দ্বিতীয় গ্লাসটারও অর্ধেকটা অবধি পরিষ্কার জল

ভর্তি করে তাতে বেশ খানিকটা নুন ঢেলে দাও। নুন জলে গলে গেলে জলটা পরিষ্কারই দেখাবে। এবার একটা হাঁসের ডিম পরিষ্কার জলে ছেড়ে দাও। ডিমটা গ্লাসের তলায় ডুবে যাবে। কারণ টাট্‌কা ডিম তার সম-আয়তনের জলের চেয়ে ভারী। ১নং চিত্র দেখ। এবার ডিমটাকে গ্লাস থেকে তুলে এনে দ্বিতীয় গ্লাসের নুন-গোলা জলে ছেড়ে দাও। দেখবে, ডিমটা এবার গ্লাসের তলায় ডুবে না গিয়ে জলের উপর ভেসে থাকবে। ২নং চিত্র দেখ। এ থেকেই বুঝতে পারবে—'ডেড্-সি'র জলে মানুষ কেন ডুবে যায় না।

এবার ডিমটাকে তুলে এনে তার গায়ে এক জায়গায় খানিকটা নরম মোম এঁটে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু সীসা বা লোহার কুচি জুড়ে দাও। সীসা বা লোহার কুচি লেগে থাকায় ডিমটা আগের চেয়ে কিছুটা ভারী হবে। ডিমটাকে এখন আবার নুন-গোলা জলের গ্লাসে ছেড়ে দাও। বেশী ভারী হয়ে থাকলে ডিমটা ধীরে ধীরে গ্লাসের
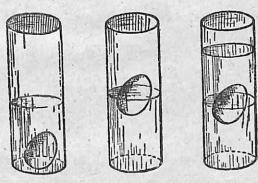
১নং চিত্র
পরিষ্কার জলে
ডিম ডুবে গেছে

২নং চিত্র
নুন গোলা জলে
ডিমটা ভেসে আছে

৩নং চিত্র
উপরে পরিষ্কার জল
নীচে নুন-গোলা জল

তলায় চলে যাবে। এক-আধটা কুচি তুলে নিলে খানিকটা হাল্কা হওয়ার দরুন ডিমটা আবার উপরের দিকে ভেসে উঠতে থাকবে।

আচ্ছা, এবার চেষ্টা করে দেখ দেখি—দু একটা কুচি খুলে নিয়ে অথবা এঁটে দিয়ে এমন ওজন করতে পার কিনা, যাতে ডিমটা জলের উপরে ভেসেও উঠবে না বা একেবারে ডুবেও যাবে না—জলের মাঝখানটায় ভেসে থাকবে ?

একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি, যাতে অতি সহজেই ডিমটাকে জলের মাঝখানটায় ভাসিয়ে রাখতে পারবে। একটা ফানেল (বাংলায় যাকে ফুঁদেল বলা হয়) সংগ্রহ করে তার লম্বা চোঙটাতে ছোট্ট একটা রবারের নল পরিয়ে দাও। ফানেলটাকে পরিষ্কার জলের গ্লাসটার উপর ধরে রবারের নলটা গ্লাসের তলা অবধি চালিয়ে দাও। এবার দ্বিতীয় গ্লাসটার নুনগোলা জল ধীরে ধীরে ফানেলের মধ্যে ঢালতে থাক। নুন-গোলা জলটা গ্লাসের নীচের দিকেই থাকবে। পরিষ্কার জলটা উপরেই থেকে যাবে এবং গ্লাসের প্রায় কানা অবধি উঠবে। ডিমটাকে এবার এই গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে, ডিমটা গ্লাসের জলের মাঝামাঝি ভেসে আছে। ৩নং ছবি দেখ।

বুমেরাং

বুমেরাং কথাটা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে! কিন্তু বস্তুটা যে কি এবং কেনই বা এই নাম—সে কথাটা জান কি ? বুমেরাং অতি সাধারণ একটা বস্তু—সামান্য একখণ্ড কাঠ মাত্র। কাঠখানা সোজা নয়, একদিকে বাঁকানো এবং অনেকটা চ্যাপ্টা। এই বাঁকানো কাঠের কার্য-ক্ষমতা অদ্ভুত। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বহুকাল থেকে পাখী-শিকারের অস্ত্র হিসাবে এবং খেলাধূলার জন্যে বুমেরাং ব্যবহার করে আসছে। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্যান্য দু-একটা দেশেও বুমেরাং ব্যবহারের কথা শোনা যায়। বুমেরাঙের মজা

হচ্ছে এই যে, কায়দা করে ছুঁড়ে মারতে পারলে, সেটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে আবার নিক্ষেপকারীর কাছেই ফিরে আসে। ফিরে আসবার কায়দাও বিভিন্ন রকমের হতে পারে। জিনিষটার গঠনে একটুখানি মোড় বা বাঁকের তারতম্য এবং ছোঁড়বার কৌশলের উপরই ফিরে আসবার রকমারি কায়দা নির্ভর করে। যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবেও বুমেরাং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলি কিন্তু নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। অনেকটা চ্যাপটা একখানা কাঠ দিয়ে বুমেরাং তৈরি করা হয়। এর চেহারা
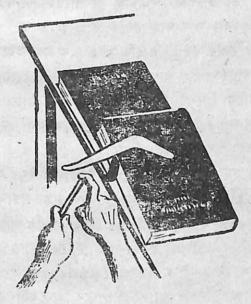
কাগজের বুমেরাং ছোঁড়বার কৌশল

অনেকটা হাতল-শূন্য দেশী লাঙ্গলের মত, কতকটা ধনুকের মতও বলা যেতে পারে। বুমেরাং ধনুকের মত বাঁকানো হলেও ওর বাহু দুটো কিন্তু সমান নয়। একটা বড় অপরটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট

সাধারণ একখানা চ্যাপ্‌টা কাঠকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলে ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সেটা আবার

ঘুরতে ঘুরতে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। কিন্তু বুমেরাঙের বিশেষত্ব হলো, সেটা ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে ঘুরতে ঘুরতেই আবার নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসবে। কথাটা হয়তো তোমরা অতিশয়োক্তি বলে ভাবতে পার। কিন্তু অতিশয়োক্তি মোটেই নয়। ব্যাপারটা সত্যই এরূপ ঘটে কিনা নিজেরাই সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। কিভাবে পরীক্ষা করবে বলে দিচ্ছি :—

ছবিতে টেবিলে রাখা বই ছু'খানার উপর ধনুকের মত বাঁকানো একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছ। এটাই বুমেরাঙের নমুনা। পাত্‌লা অথচ শক্ত একখণ্ড কার্ডবোর্ড থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে ওই রকমের একটা জিনিষ তৈরি কর। ৫ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি লম্বা করলেই চলবে। এর একটা বাহুর চেয়ে অপর বাহুটা যেন একটু ছোট হয়। বড় বাহুর লেজটাকে পাশের দিকে সামান্য একটু মোচড় দিয়ে দিলে অনেকটা ভাল ফল হবে। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনি করে টেবিলের ধার ঘেঁষে একখানা বই রেখে তার উপর আর একখানা বই ঢালু ভাবে রাখ। ঢালু বইখানার উপর কার্ডবোর্ডের বুমেরাংটাকে ছবির মত করে বসাও। বুমেরাঙের লম্বা বাহুটা যেন টেবিলের ধার থেকে খানিকটা বাহিরের দিকে বেরিয়ে থাকে।

এবার একটা পেন্সিল বা শক্ত কাঠি এক হাতে ধর। অপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে—ঠিক মার্বেল ছোঁড়বার মত করে কাঠি বা পেন্সিলের মাথার দিকটা খানিকটা পিছনে টেনে হঠাৎ ছেড়ে দাও। পেন্সিলের উপরের দিকটা ছিট্‌কে গিয়ে বুমেরাঙের বাহুটাকে আঘাত করবে। সঙ্গে সঙ্গে কার্ডবোর্ডের বুমেরাংটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দেখবে, খানিক দূর যাওয়ার পর সেটা মাটিতে না পড়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার তোমার কাছেই ফিরে এসেছে। কেন এমন হয়—এস্থলে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বড় হয়ে পড়াশোনা করলেই বুঝতে পারবে।

ঘূর্ণায়মান সর্প

তোমরা অনেকেই হয়তো ছোটখাট অনেক রকম ম্যাজিক ও বিজ্ঞানের খেলা জান। ম্যাজিকের খেলা অনেকটা হাতের কৌশল বা চোখের ধাঁধা হলেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি উন্মেষের সহায়ক। আর বৈজ্ঞানিক খেলা—যেগুলি তোমরা আমোদ উপভোগের জন্যে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই শিখছ—বড় হয়ে যখন বিজ্ঞানের বিষয় পড়বে তখন দেখবে—তাতে কত বৈজ্ঞানিক তথ্য, কত প্রাকৃতিক রহস্য ছেলে-বেলাতেই জেনে ফেলেছ! বৈজ্ঞানিক খেলার মধ্যে অনেকগুলি সহজসাধ্য হলেও প্রকৃত কারণটা অনেক সময় সহজবোধ্য হয় না।

১নং চিত্র

গোল কাগজখানাকে প্যাঁচানোভাবে কাটা হয়েছে

কিন্তু বারংবার অনুশীলনের ফলে দুর্বোধ্য রহস্যও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই তোমাদের বিজ্ঞানানুরাগী করে গড়ে তোলবার জন্যে যেসব কৌতূহলোদ্দীপক খেলা বা পরীক্ষার কথা বলা হয়—আশা করি সেগুলি নিজের হাতে করে দেখবার চেষ্টা করবে। এখন

তোমাদের এরকমের একটা বৈজ্ঞানিক খেলার কথা বলে দিচ্ছি, যেটা খুব সহজেই করে দেখতে পার।

তোমরা সবাই জান গরম বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু গরম বাতাসের উর্ধ্বগতির প্রমাণ কি? ঠাণ্ডাই হোক আর গরমই হোক বাতাস তো আর চোখে দেখা যায় না। চোখে না দেখলেও বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় সেটা প্রমাণ করা যায়। তারই একটা পরীক্ষার কথা বলছি। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়—খুবই সাধারণ তবে পরীক্ষাটা তোমাদের পক্ষে বেশ উপভোগ্য হবে বলেই মনে হয়

২নং চিত্র
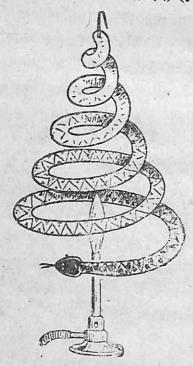
কাগজের কুণ্ডলীটাকে বার্ণারের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

পোস্টকার্ডের মত পুরু একখানা বড় কাগজ যোগাড় কর। কম্পাস দিয়ে কাগজখানার উপর তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত এঁকে

সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল। ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একখানা গোল কাগজের চাক্‌তি পাবে। কম্পাসের কাঁটাটা একটু চেপে বসিয়ে দিলেই কেন্দ্রস্থলের বিন্দুটা বেশ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। এই ছিদ্রটা এমন হওয়া চাই যেন একটা আলপিন আলতোভাবে তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে; কিন্তু আলপিনের পিছনের দিকের বোতামের মত মাথাটা গলে যাবে না। এবার গোল কাগজখানাকে কাঁচি দিয়ে (বাঁকানো কাঁচি হলেই ভাল হয়) ভিতরের দিকে প্যাঁচানোভাবে কেটে দাও। ১নং ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে কাটবে। এভাবে কাটবার পর গোল কাগজখানা একটা কুণ্ডলীতে পরিণত হবে। কাগজের কুণ্ডলীর উপর এবার সাপের গায়ের মত চাকা চাকা দাগ এঁকে দাও। জিনিষটাকে একটা সাপের মতই দেখাবে।

কাগজের কুণ্ডলীটার কেন্দ্রস্থলের সরু ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে একটা আলপিন গলিয়ে তার উপরের দিকের সরু মুখটা বঁড়শির মত করে বাঁকিয়ে দাও। এই বাঁকানো মুখটার সঙ্গে সুতো বেঁধে কুণ্ডলীটাকে উপরের কিছুর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ। পিনের গোড়ার দিকের বোতামের মত পদার্থটার জন্যে কাগজের কুণ্ডলীটা বেশ ঝুলে থাকবে এবং ঘুরতেও পারবে। কাগজের কুণ্ডলীটাকে ঝুলিয়ে দিলেই সেটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত খানিকটা নীচের দিকে ঝুলে পড়বে। এবার কুণ্ডলীটার মধ্যস্থল বরাবর কিছুটা নীচে একটা মোমবাতি অথবা গ্যাস বার্ণার জ্বালিয়ে দিলেই সেটা ঘুরতে সুরু করবে। ২নং ছবি ভাল করে দেখে নাও; ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে।

কাগজের কুণ্ডলীটা ঘোরে কেন—বুঝতে পেরেছ তো?

বাতির শিখার চারদিকের বাতাস গরম হওয়ার ফলে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সেই বায়ুপ্রবাহের ধাক্কায় কুণ্ডলীটা ঘুরতে থাকে। এটা গরম বাতাসের উর্ধ্বগতির প্রামাণ্য পরীক্ষা তো বটেই, আমোদজনক খেলাও নয় কি?

পাতার নাচন

এবার একটা জলজ উদ্ভিদের পরীক্ষার কথা বলব। পরীক্ষা খুবই সহজ, যদি একটু কষ্ট করে কোন পুকুর থেকে উদ্ভিদগুলি যোগাড় করতে পার। খাল, বিল, পুকুরের জলে এক রকমের লতানে গাছ জন্মে। তেঁতুল পাতা দেখতে যেমন হয় এই জলজ লতার পাতাগুলিও অনেকটা সেই রকমের। এক একটা সরু লম্বা ডাঁটার চারদিকে পাতাগুলি যেন স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। এই লতানে গাছগুলি সাধারণতঃ জলঝাঁঝি নামে পরিচিত। ইংরেজীতে বলে—হাইড্রিলা। পাড়াগাঁয়ে তো অভাবই নেই, কলকাতার উপকণ্ঠে অনেক পুকুরে এই গাছগুলিকে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে দেখা যায়।
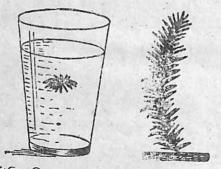
জলঝাঁঝির ছিন্ন পাতা গ্লাসের জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

একটা কাচের গ্লাসের অর্ধেকের বেশী জল ভর্তি কর। অল্প কয়েকটা পাতাসমেত জলঝাঁঝির কয়েকটা ডগা ছোট্ট করে কেটে নিয়ে সেগুলিকে গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে—কয়েকটা জলের তলায় ডুবে যাবে, আবার কয়েকটা হয়তো ভেসে থাকবে। যেগুলি জলের তলায় ডুবে গেছে, তার মধ্য থেকে দু-একটা ভারী ডগা বেছে রেখে বাকিগুলি ফেলে দাও। গ্লাসটাকে এবার এমন একটা জায়গায় রাখ, যেখানে বেশ একটু আলো আছে। আমরা যে

সোডাওয়াটার ব্যবহার করি, সে রকমের এক বোতল সোডাওয়াটার নিয়ে এস। বোতলটা খুলে গ্লাসের জলে কয়েক ফোঁটা সোডাওয়াটার ঢেলে দাও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখবে, জলঝাঁঝির ডগাগুলি এবার নীচ থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে আসছে। জলের উপরে এসেই কাটা দিক থেকে ছোট্ট এক ফোঁটা বুদ্‌বুদ্‌ ছেড়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে গ্লাসের তলার দিকে নেমে যাবে। তারপর থেকে ডগাটা ক্রমাগতই এরূপ উপরে-নীচে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

একটু ভারী ও সুবিধামত পাতা বাছাই করবার উপরই এই পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। পরীক্ষাটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। যদি দেখ পাতাটা ঠিকমত ওঠা-নামা করছে না, তবে ডগা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গ্লাসের জলে ফেলবে। দেখবে —প্রত্যেকটা পাতাই ওভাবে ওঠা-নামা করছে। যদি তাতেও সুবিধা না হয় তবে আরও কয়েক ফোঁটা সোডাওয়াটার জলে ঢেলে দেবে। পরীক্ষাটা যদি ঠিকমত করতে পার, তবে নিজেই বুঝতে পারবে, কেন পাতাগুলি এভাবে ওঠা-নামা করে।

কলের পাখী

সবাই তোমরা এরোপ্লেন দেখেছ। অনেকটা পাখীর মত দেখতে হলেও এরোপ্লেন কিন্তু পাখীর মত ওড়ে না। এরোপ্লেন বাতাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় প্রোপেলারের টানে। এরোপ্লেনের সামনে বৈদ্যুতিক পাখার মত জিনিষটাই হচ্ছে প্রপেলার। আর পাখীরা উপরে-নীচে ডানা আন্দোলন করে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তোমরা অনেকেই হয়তো খেলনা এরোপ্লেন তৈরি করেছ; কিন্তু পাখীরা যেমন করে আকাশে ওড়ে, ঠিক তেমন কায়দায় কোন ওড়বার যন্ত্র তৈরি করে

দেখেছ কি? ডানা নেড়ে ঠিক পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে এরকমের খুব সহজ একটা যন্ত্র তৈরি করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। ছবিটা দেখে অনায়াসে এই রকমের একটা কলের পাখী তৈরি করতে পারবে।

ছবিটাকে ভাল করে দেখে নাও। উপরের 'ক' চিহ্নিত ছবিটাতে কলের পাখীর পুরোপুরি নমুনা দেওয়া হয়েছে। কি কৌশলে 'ক' চিহ্নিত পাখীটা ডানা কাঁপিয়ে বাতাসে উড়বে, 'খ' চিহ্নিত চিত্রে সেটা একটু বড় করে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে ছবি থেকেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

প্রথমে খানিকটা লম্বা—ধর, প্রায় দেড় ফুট লম্বা একটা মোটা তার সোজা করে নাও। এই লম্বা তারটার একদিকে ইংরেজী Y অক্ষরের মত দুটো খুঁটি বসাতে হবে। (ছবির ৫নং দেখ)। ১নং এবং

কলের পাখী
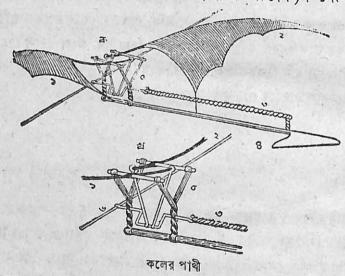
২ নম্বরের ডানার ফ্রেম দুটোকে ৫ নম্বরের খুঁটির দুটো বাহুর সঙ্গে সমান্তরালে বসানো দু-খণ্ড সোজা তারের উপর এমনভাবে বসিয়ে দাও যাতে ডানা দুটো অতি সহজেই উঁচু-নীচু ওঠা-নামা করতে পারে। ৫ নম্বরের খুঁটি দুটোর একটু নীচের দিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে

৬ নম্বরের মত উভয়দিকে সমকোণে বাঁকানো একটা তার গলিয়ে দাও। এই তারটার সামনের দিকে আর একটা শক্ত তার সমকোণে হাতলের মত জুড়ে দিতে হবে। ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলানো ওই তারটার পিছনের দিকটা হুকের মত বাঁকিয়ে দিতে হবে। এই হুকটার সঙ্গে সংলগ্ন দু-গাছা বা চারগাছা সরু রবারের ব্যাণ্ড ফ্রেমের শেষ প্রান্তে আর একটা শক্ত হুকের সঙ্গে আট্‌কানো থাকবে (চিত্রের ৩নং দেখ)। ১নং ও ২নং ডানার ফ্রেমের গোড়ার দিকের দু-প্রান্ত, ৬নং তারের মধ্যকার ভাঁজের সঙ্গে দু-দিক আংটির মত বাঁকানো ছোট্ট দুটি সোজা তার দিয়ে ছবির মত করে পরিয়ে দেবে। ডানার কাঠামোটাকে এবার সেলোফেন বা কলোডিয়ন বেলুনের পাত্‌লা পর্দা দিয়ে মুড়ে দাও। সোলোফেন-মোড়া ডানা দুটোর চওড়া দিকের মুক্ত প্রান্ত সুতো দিয়ে ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। ফ্রেমটার শেষের দিকে থাকবে ৪ নম্বরের মত পাত্‌লা লেজ।

এভাবে যন্ত্রটা তৈরি করবার পর ৬ নম্বরের হ্যাণ্ডেলটাকে যে কোন একদিকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিলেই রবারের ব্যাণ্ডগুলি দড়ির মত পাকিয়ে যাবে। এই অবস্থায় যন্ত্রটাকে একটু হেলানোভাবে আকাশের দিকে ছেড়ে দিলেই দড়ির পাক খোলবার সঙ্গে সঙ্গে ৬ নম্বরের তারটাও ঘুরতে থাকবে। ফলে খাড়া তার দুটোর সাহায্যে ডানা দুটোকে ঠিক উড়ন্ত পাখীর ডানার মত উপরে-নীচে আন্দোলিত করতে থাকবে। এর ফলে যন্ত্রটা ঠিক পাখীর মতই আকাশে উড়ে যাবে। অবশ্য যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণই মাত্র উড়তে পারবে। ভারী জিনিষ নিয়ে বেশীক্ষণ দম রাখবার উপযুক্ত হাল্কা মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে পারলে তোমরাও এভাবে অনায়াসে পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পার।

পিস্তল ধনুক

ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে—ব্যাপারটা কি? সাধারণ ধনুককে পিস্তল বা বন্দুকের মত ব্যবহার করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধনুক ঠিক পিস্তলের মত এক হাতে বা বন্দুকের মত দু-হাতেও ছোঁড়া যায়। এর পাল্লাও বড় কম নয়—ছোট, বড় সব রকম শিকারকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘায়েল করা যায়। এর নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; ছবি থেকেই সহজে বোঝা যাবে। ধনুকটা যত বড় হবে তদনুযায়ী একখানা সরু লম্বা কাঠের উপরদিকে, বরাবর লম্বা খাঁজ কেটে নাও। ধনুকটা কাঠখানার সম্মুখভাগে শক্তভাবে আঁটা থাকবে। কাঠখানার পিছনে ধরবার সুবিধার জন্যে পিস্তলের মত বাঁট তৈরি করা দরকার। এই বাঁটের কাছে, উপর-নীচে এফোঁড়-ওফোঁড় করে একটা ছিদ্র
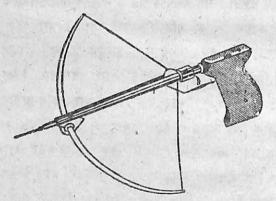
পিস্তল-ধনুক

কর ছিদ্রটা এমন হবে যেন মোটা পেরেকের মত একখণ্ড লোহার তার আলতোভাবে তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। লোহার তারের বদলে ছবির মত পাতলা একখণ্ড লোহার পাতও বসাতে পার। ছোট্ট একটা স্প্রিঙের সাহায্যে এই তার বা পাতটা কাঠের ছিদ্রের মধ্যে

এমনভাবে বসানো থাকবে যে, উপর থেকে টিপলেই নীচে নেমে যায়, আবার ছেড়ে দিলেই খানিকটা উপরে উঠে আসে। এই লোহার তারটার উপরের দিকটা থাকবে, ইংরেজী U অক্ষরের মত চেরা। কাঠখানার নীচের দিকে বাঁটের কাছে, পিস্তলের ট্রিগার বা ঘোড়ার মত একটা চাবি বসাও। ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলানো তারটার নীচের প্রান্তভাগ চাবির সঙ্গে কব্জার মত করে এমনভাবে সংলগ্ন থাকবে যে, চাবিটাকে পিছন দিকে একটু টানলেই তারটা ছিদ্রের খানিকটা নীচে চলে আসে ; আবার ছেড়ে দিলেই উপরে উঠে যায়।

এবার ধনুকের ছিলাটাকে টেনে এনে চাবিসংলগ্ন ওই তারটার পিছনদিকে পরিয়ে দাও। তীরের লেজটাতেও একটু খাঁজকাটা থাকবে। তীরটাকে লম্বা কাঠের খাঁজের মধ্যে বসিয়ে লেজটাকে তারের U অক্ষরের মত ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছিলার সঙ্গে লাগিয়ে দাও। এবার লক্ষ্য স্থির করে চাবি টিপলেই তীরটা ছুটে বেরিয়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, আরও অন্যান্য কৌশলেও এরকমের ধনুক তৈরি করা যায়।

তীর-ছোঁড়ার গুল্‌তি

এবার তোমাদিগকে খুব সাধারণ একটা জিনিস তৈরির কথা বলছি। জিনিসটা তোমাদের সবাই-এর কাছেই পরিচিত এবং অনেকে হয়তো করেই দেখেছ! যারা করে দেখো নি, এবার তারা করে দেখো।

পাখি-মারা গুল্‌তি তোমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকবে! লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবার জন্যে তোমরা গুল্‌তিতে ইট বা পাথরের

কুচি অথবা ছোট ছোট পোড়ামাটির ডেলা ব্যবহার করে থাক। গুলতির সাহায্যে ডেলাগুলিকে খুব জোরে ছুঁড়ে মারা যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা সহজ নয়! লক্ষ্যভেদ করতে হলে গুল্‌তি ছোঁড়বার বিশেষ নৈপুণ্য এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু মাটির ডেলা
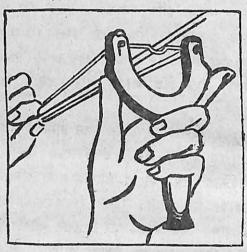
তীর-ছোঁড়া গুল্‌তি

বা পাথরের টুকরোর পরিবর্তে যদি তীর ব্যবহার কর তবে দেখবে, লক্ষ্যভেদ করা কত সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা সাধারণত যে রকমের খেলনা গুল্‌তি ব্যবহার কর, তীর ছুঁড়তে হলে তার কাঠের ফ্রেমটা আর একটু বড় করে নিলে সুবিধা হয়। রবারের ফিতেটাকেও তদনুযায়ী বড় করে নেওয়া ভাল। অবশ্য সাধারণ গুল্‌তিতেও তীর ছোঁড়া চল্‌তে পারে। তবে তীর ছুঁড়তে হলে একটু নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। সে কথা বলছি।

এক গাছা সরু তারের মাঝখানটা অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকিয়ে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে সেই বাঁকানো তারটাকে গুল্‌তির ফ্রেমের বাহু দুটোর প্রান্তভাগে আট্‌কে দাও। এবার তারের ওই বাঁকানো জায়গাটার উপর তীরটাকে রেখে লক্ষ্য স্থির করে রবারের ফিতে টেনে ছেড়ে দাও—দেখবে কত সহজে লক্ষ্যভেদ

করতে পারা যায়। গুল্‌তিটাকে যদি কোন ভারী ফ্রেম বা স্ট্যাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে বসিয়ে ব্যবহার করতে পার, তবে লক্ষ্যভেদ করা আরও সহজ হবে।

এবার আর একরকমের তীর-ছোঁড়া গুল্‌তির কথা বলছি। জিনিসটা কি রকম হবে, ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একখানা চৌকো কাঠের মধ্যে লম্বালম্বি ছিদ্র কর। ঐ ছিদ্রের উপরে পাশাপাশিভাবে কাঠখানার মধ্যে একটু মোটা ছিদ্র করে ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা, পেন্সিলের চেয়ে মোটা এক টুক্‌রো শক্ত কাঠের রড বেশ এঁটে ঢুকিয়ে দাও।
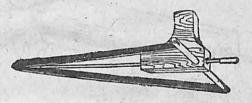
তীর-ছোঁড়া গুল্‌তি

এই রডের দু-প্রান্তে রবারের একটা লম্বা ফিতা বেঁধে দাও। চৌকো কাঠখানার নীচের দিকে ধরবার জন্যে একটা হাতল লাগাতে হবে। এবার ফলাশূন্য তীর লম্বালম্বি ছিদ্রটার ভিতর দিয়ে পরিয়ে ফিতে টেনে ছেড়ে দিলেই তীরটা ঠিক সোজাসুজি ছুটে যাবে।

তীর ছোঁড়া বন্দুক

তোমাদের কয়েক রকম তীরছোঁড়া গুল্‌তি তৈরির কথা বলছি। এবার এর চেয়ে আরও জোরালো অন্য আর এক রকম লক্ষ্যভেদী তীর ছোঁড়বার ব্যবস্থার কথা বলছি।

এটাও গুল্‌তির মতই একটা ব্যাপার, তবে রকমফের মাত্র।

হাতদেড়েক লম্বা একখানা চৌকো কাঠ সংগ্রহ কর। কাঠখানাকে লম্বালম্বিভাবে সমান দু-ভাগে চিরে ফেল। অর্ধ গোলাকার বাটালি দিয়ে দু-খানা কাঠেরই ভিতর দিকে লম্বালম্বিভাবে নালি কেটে দাও। এবার নালি-কাটা কাঠ দু-খানাকে পূর্বের মত একত্র করে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিলেই দেখবে—বেশ সোজা একটি নল হয়ে গেছে। বেশ শক্ত এবং পুরু একটা রবারের ব্যাণ্ড যোগাড় করতে হবে। মোটরের পুরনো টিউব থেকে ফিতের মত করে কেটে নিলেও চলে। পেরেক
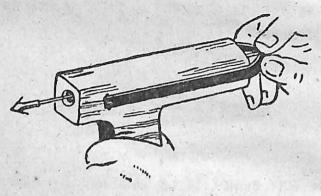
তীর-ছোঁড়া বন্দুক

দিয়েই হোক, কি অন্য যে কোন রকমেই হোক, কাঠের নলটার সামনের মুখের প্রায় কাছাকাছি ফিতের দু-প্রান্ত দু-দিকে এঁটে দাও। ফিতেটা কাঠের নলের পিছনের দিক দিয়ে ঘুরে যাবে। ছবিটা দেখে নাও, সহজেই বুঝতে পারবে। ধরবার জন্যে বন্দুকের হাতলের মত কাঠখানার সামনের দিকে স্ক্রু এঁটে একটা হাতল বসিয়ে নিতে হবে। এটা হলো কাঠের বন্দুক। এবার নলের সামনের দিক দিয়ে একটা তীর ঢুকিয়ে রবারের ব্যাণ্ডকে টেনে ছেড়ে দিলেই দেখবে—তীরটা কত জোরে সোজা ছুটে চলে।

বোতল ব্যারোমিটার

বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে। যে যন্ত্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ধারণ করা যায়, তাকে বলে ব্যারোমিটার বা বায়ুমান যন্ত্র। তোমরা অনেকেই
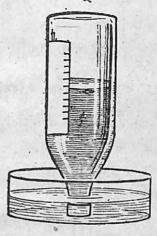
বোতল-ব্যারোমিটার

হয়তো ব্যারোমিটার দেখে থাকবে! আজ তোমাদের সহজ এক রকম ব্যারোমিটার তৈরির কথা বলছি। যে কেউ এই যন্ত্র তৈরি করে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারবে।

একখণ্ড কাগজের গায়ে স্কেলের মত দাগ কেটে সেটাকে একটা বোতলের গায়ে এঁটে দাও। বোতলটাকে অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি কর। একটা চায়ের পিরিচ বা কানা-উঁচু পাত্রে খানিকটা জল রেখে তার মধ্যে জল-ভর্তি বোতলটাকে উল্টো করে বসিয়ে দাও। এটাই হবে ব্যারোমিটার। বোতলের গায়ের স্কেলের সাহায্যে দেখতে পাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জলের লেভেলও উঁচু-নীচু হবে। আবহাওয়ার সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখে নিলেই পরে জলের লেভেলের পরিবর্ত্তন দেখে আবহাওয়ার আসন্ন দুর্যোগের কথা বুঝতে পারবে। বোতল ব্যারোমিটার তৈরির ব্যবস্থাটা সহজেই বুঝতে পারবে ছবি থেকে।

চুলের তৈরি হাইগ্রোমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাপ করা যায়, তাকে বলে হাইগ্রোমিটার। অতি সহজ উপায়ে এক রকম হাইগ্রোমিটার
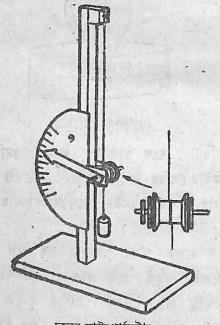
চুলের হাইগ্রোমিটার

তৈরি করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো—অনায়াসেই এরকমের হাইগ্রোমিটার তৈরি করতে পারবে। প্রায় এক ফুট

লম্বা কয়েকগাছা চুল সংগ্রহ কর। জলমিশ্রিত কষ্টিক সোডা (হাল্কা সলিউসন) দিয়ে চুলের তৈলাক্ত পদার্থ বেশ করে পরিষ্কার করে নাও। এবার একগাছা চুলের একপ্রান্ত একটা স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে আট্‌কে দাও এবং চুলটার প্রান্তে ছোট্ট একটা সীসার বল ঝুলিয়ে দাও। স্ট্যাণ্ডের নীচের দিকে, দু-পাশে আট্‌কানো দুখানা ছিদ্র করা টিনের পাতের মধ্যে একটা সূচের উপর লাটাইয়ের মত করে খুব হাল্কা একটা কাটিম বসাতে হবে। কাটিম্‌টা যেন খুব সহজভাবে দুদিকেই ঘুরতে পারে। ভার-ঝুলনো চুলটাকে কাটিমটার উপর দিয়ে এক কি দুই পাক ঘুরিয়ে নিতে হবে। কাটিম-বসানো সূচটার একদিকে কাগজ থেকে কাটা তীরের ফলা এঁটে দিতে হবে। সাদা পোস্টকার্ডে অর্ধবৃত্তাকারে স্কেল এঁকে সেটাকে তীরের ফলাটার প্রায় গা ঘেঁষে ঘড়ির ডায়েলের মত করে বসিয়ে দাও। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, ব্যবস্থাটা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। বায়ুমণ্ডলের কম-বেশী আর্দ্রতা অনুযায়ী চুলের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে কাটিমটার সঙ্গে তীরের ফলাটাও ঘুরে গিয়ে ডায়েলের উপর আবহাওয়ার অবস্থার নির্দেশ দেবে।

পেরিস্কোপ

তোমরা খেলার মাঠে বা বড় বড় সভা-সমিতিতে নিজের হাতে তৈরি পেরিস্কোপ ব্যবহার করতে দেখেছ। দৃষ্টিপথে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকলে পেরিস্কোপের সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করতে পারা যায়। বিভিন্ন রকমের পেরিস্কোপ তৈরি হতে পারে এবং তৈরি করাও খুব সহজ। তোমরা যাতে নিজের হাতে তৈরি করতে পার, সে জন্যে দু-রকমের পেরিস্কোপ তৈরির উপায় বলে দিচ্ছি।

কার্ডবোর্ড, টিন, কাঠ বা অন্য কিছু দিয়ে একটা লম্বা চতুষ্কোণ

বাক্সের মত তৈরি কর। এই লম্বা বাক্সটার দু-প্রান্তে পাশের দিকে বিপরীতভাবে দুটো চতুষ্কোণ গর্ত করতে হবে। উপরের প্রান্তে
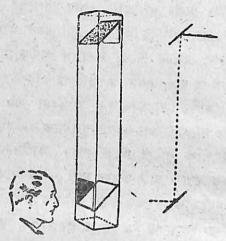
১নং চিত্র

পেরিস্কোপে আয়না বসাবার ব্যবস্থা

একখানা চৌকো আয়না ৪৫ ডিগ্রিতে হেলানোভাবে বসাও। এই আয়নার কাচটা থাকবে পাশের গর্ত বরাবর নীচের দিকে মুখ করে। নীচের গর্তের কাছেও পূর্বের আয়নার মত ৪৫ ডিগ্রি হেলানোভাবে আর একখানা আয়না বসাও। এই আয়নার কাচটা থাকবে উপরের দিকে মুখ করে। উপর ও নীচের দুটো আয়নাই এমনভাবে হেলিয়ে বসাবে যেন তারা পরস্পর সমান্তরালে থাকে। এবার লম্বা বাক্সটার উপরের মুখ উঁচু করে ধরে নীচের কাচখানার দিকে তাকালেই যে কোন প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে দূরের দৃশ্য দেখতে পাবে। ১ নম্বরের ছবিখানা ভাল করে দেখে যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা কর। এছাড়া একটা লম্বা লাঠির দুপ্রান্তে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে দুখানা আয়না বসিয়ে দিলেও ঠিক ওই রকমের কাজ হবে। উপরের কাচখানাকে সুতো বেঁধে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থাও করতে পারি।

আর একরকম পেরিস্কোপ তৈরি করতে পার—যা একটু জটিল হলেও তৈরি করতে তেমন কোন গুরুতর অসুবিধা নেই। ২নম্বরের ছবি দেখ। যন্ত্রটা হবে এই ছবির মত। শক্ত কার্ডবোর্ডের চওড়া
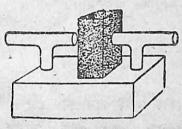
২নং চিত্র

শয়ানভাবে তৈরি পেরিস্কোপ

একটা বাক্স যোগাড় কর। ইংরেজী T অক্ষরের মত কাগজের দুটি চোঙ তৈরি করতে হবে। T-এর আকৃতিবিশিষ্ট এই চোঙ দুটিকে বাক্সটার উপরে ছিদ্র করে এঁটে বসিয়ে দাও। এবার ৩ নম্বরের

৩নং চিত্র
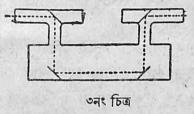
ছবি দেখ। দুটো চোঙের মধ্যেই দুখানা আয়না ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে বসাতে হবে। চোঙের ভিতরকার আয়নার মুখ থাকবে নীচের দিকে। চোঙ বরাবর বাক্সের তলায়ও দু-দিকে দুখানা আয়না থাকবে হেলানোভাবে, উপরের আয়নার সমান্তরালে। নীচের আয়না দুখানার মুখ থাকবে উপরের দিকে।

যে কোন একদিকের চোঙের মধ্য দিয়ে তোমার বন্ধুদের কোন একটা জিনিস দেখতে বল। বেশ দেখা যাবে। এবার একখানা ইট, কাঠ বা মোটা বই চোঙ দুটোর মধ্যস্থলে ২নং ছবির মত করে দাঁড় করিয়ে দাও। বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভাববে—এবার আর চোঙের

মধ্যে দিয়ে পূর্বের সেই দূরের জিনিসটাকে দেখা যাবে না। কিন্তু চোঙের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তারা অবাক হয়ে যাবে—দূরের জিনিসটা আগের মতই দেখা যাচ্ছে। ইট, কাঠ বা বই মধ্যস্থলে রাখাতেও দেখবার অসুবিধা হচ্ছে না।

চুম্বক বড়শী

কয়েকটি ছেলে ছোট একটা নৌকোয় চেপে খালের জলে বাইচ খেলছিল। অসতর্কতার ফলে একটি ছেলের হাত থেকে দামী একখানা রজার্সের ছুরি জলে পড়ে যায়। ছুরিটা উদ্ধার করবার জন্যে এক একজন এক এক রকম মতলবের কথা বলছিল। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জলে কেউ নামতে রাজী নয়। তাছাড়া জলে নেমে যে ছুরিটা উদ্ধার করা সম্ভব নয়, সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ খোঁজাখুঁজিতে ছুরিটার পাঁকের তলায় চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। একটি ছেলে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে বললো, আমি নৌকোয় বসেই ছুরিটা তোলবার ব্যবস্থা করছি, আমাকে পাড়ে তুলে দাও। বাড়ি তার ওখান থেকে খুব কাছেই। তাকে পাড়ে তুলে দেওয়া হলো। বাড়িতে ছেলেটির একটা পুরনো চুম্বক লোহা ছিল। প্রায় মিনিট কুড়ির মধ্যেই চুম্বক লোহাটা আর এক গাছা লম্বা দড়ি নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল। চুম্বকটাকে দড়ির এক প্রান্তে বেঁধে নৌকোয় বসেই সেটাকে জলে নামিয়ে দিল। ছুরিটা যেখানে পড়েছিল, দড়ি-বাঁধা চুম্বকটাকে সেখানে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করবার পরই ছুরিটা চুম্বকের গায়ে লেগে উঠে এল।

তোমাদের অনেকেরই এরকম বুদ্ধি খেলে নিশ্চয়! অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফলে এই বুদ্ধিই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ করে থাকে।

পেণ্ডুলামের খেলা

দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম তোমরা সবাই দেখেছ। সরু তারের সঙ্গে ঝুলনো একটা ভারী জিনিস সমান তালে এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে। লম্বা সুতোর এক প্রান্তে কোন ভারী জিনিস বেঁধে উঁচু জায়গা থেকে ঝুলিয়ে একবার দুলিয়ে দিলেই অনেকক্ষণ ধরে দোল খেতে থাকে। এটাই হলো পেণ্ডুলাম। পেণ্ডুলামকে বাংলায় বলা হয় দোলক। বড় হয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের বই পড়বার সময় তোমরা দোলক সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে। এখন তোমাদের দোলকের একটা কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষার কথা বলছি। দোলক সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক রহস্য না জেনেও পরীক্ষাটি তোমরা অতি সহজেই করতে পারবে। এটাকে খেলা বলছি এজন্যে যে, ব্যাপারটা দেখে তোমরা বেশ অবাক না হয়ে পারবে না। বড় হয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনার সময়ও তোমাদের এসব পরীক্ষা করতে হবে। খেলাচ্ছলে এখনই সেগুলি করে দেখলে, পরে বুঝতে পারবে দুরূহ রহস্যগুলিও তোমাদের কাছে কত সহজ বলে মনে হচ্ছে।

পেণ্ডুলামের খেলার ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে মাত্র—খানিকটা সুতো আর দু-টুক্‌রো পাথর বা অন্য কোন ভারী জিনিস। পাথরের টুক্‌রোই হোক, কি অন্য কোন ভারী জিনিসই হোক—দুটোর ওজনই কিন্তু সমান হওয়া দরকার। পাথরের টুক্‌রো দুটোর সঙ্গে দু-গাছা লম্বা সুতো বেঁধে নিতে হবে। তারপর দু-দিকে দুটো খুঁটির সঙ্গে একগাছা সুতো টাঙিয়ে দাও। সুতোটা বেশ টান করে বাঁধবে। এখন খুঁটির সঙ্গে টাঙানো সুতো থেকে সুতোয় বাঁধা পাথরের টুক্‌রো দুটো ঝুলিয়ে দিতে হবে। ঝুলনো পাথরের টুক্‌রো দুটো যেন পরস্পর থেকে বেশ কিছুটা তফাতে থাকে এবং সুতো দুটোও সমান হওয়া দরকার। এই হলো পরীক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম। মোটের উপর ব্যাপারটা হবে—আড়াআড়িভাবে টাঙানো সুতোর সঙ্গে ঝোলানো দুটো দোলক।

পাথরের টুক্‌রো দুটো যখন স্থিরভাবে থাকবে, তখন যে কোন একটা দোলককে হাত দিয়ে সামনে পিছনে একটু দুলিয়ে দাও। দোলকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকবে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—দ্বিতীয় দোলকটাও (যেটা একেবারে স্থির ছিল) একটু
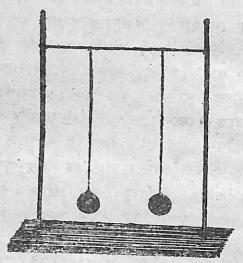
আড়াআড়িভাবে টাঙানো স্থতোর সঙ্গে
দুটি পেণ্ডুলাম ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

একটু করে দুলতে স্থরু করেছে। আরও কিছুক্ষণ লক্ষ্য কর। দেখবে—দ্বিতীয় দোলকটার দোলন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু প্রথমটার দোলন ক্রমশ কমে আসছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখবে—প্রথমটার দোলন প্রায় থেমে আসছে, কিন্তু দ্বিতীয়টার দোলন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! এরপর আবার প্রথমটার দোলন পূর্বের মতই বেড়ে যাবে। এমনিভাবে দোলক দুটো পর্যায়ক্রমে পরপর একবার আস্তে আবার জোরে দুলতে থাকবে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যাবে যে, দুটো দোলকই প্রায় সমানভাবে দুলছে। অনেকক্ষণ এভাবে দুলতে দুলতে অবশ্য দুটো দোলকই এক সময়ে স্থির হয়ে যাবে।

দোলক দুটো কেন এমন অদ্ভুত ব্যবহার করে, বার বার পরীক্ষার ফলে সহজেই সে কথাটা বুঝতে পারবে।

চুম্বকের খেলা

১.

চুম্বক-লোহা তোমাদের অপরিচিত নয়। চুম্বক-লোহা দিয়ে তোমরা অনেকেই হয়তো অনেক রকমের মজার খেলা করে দেখেছ! আজকে তোমাদের ওই রকমের আরও দু-একটা খেলার কথা বলবো। খেলাগুলি খুবই সহজ; কিন্তু একটু বুদ্ধি করে করতে পারলে বেশ কৌতুকজনক হবে।

প্রথমে কয়েকটা সেলাই করবার স্থচ, কয়েকটা কর্ক এবং ছোট্ট একটা বার-ম্যাগ্‌নেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক-লোহা যোগাড় করতে হবে। বাজারে সাধারণত দুরকমের চুম্বক লোহা কিনতে পাওয়া যায়। এক রকমের চুম্বক-লোহা ঘোড়ার নালের মত বাঁকানো, আর এক রকম চ্যাপ্টা অথচ লম্বা। দু-ইঞ্চি কি আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা চুম্বক-লোহা হলেই কাজ চলবে। প্রথমে স্থচগুলিকে চুম্বক-স্থচে পরিণত করতে হবে। কেমন করে করবে জান তো? স্থচের চোখের দিকটায় ধরে বার-ম্যাগনেট্‌খানার যে-কোন একটা প্রান্তের উপর দিয়ে সামনে থেকে পিছনের দিকে বার কয়েক আলতোভাবে ঘষ্‌ড়ে টেনে নাও। দেখবে—স্থচটা চুম্বকের গুণ পেয়ে গেছে। স্থচগুলিকে যে-কোন দিকে ধরে চুম্বক-লোহার যে-কোন প্রান্তে ঘষ্‌ড়ালেই চুম্বকের গুণ পাবে। তবে এই পরীক্ষাটার জন্যে সবগুলি স্থচকে একই রকমে চুম্বকশক্তি-সম্পন্ন করতে হবে। এবার ছবির মত করে এক একটা কর্কের মধ্যে চুম্বক-স্থচ এমনভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও যেন স্থচের সরু মুখটা নীচের দিকে থাকে। একটা বড় পাত্রে জল ভর্তি করে কর্ক-আঁটা স্থচগুলিকে জলে ভাসিয়ে দাও। দেখবে—একই রকম চুম্বক-মেরুর পরস্পর বিকর্ষণের ফলে স্থচগুলি

দূরে দূরে সরে গিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্যামিতিক নক্সা রচনা করেছে। সূচের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই বিভিন্ন রকমের জ্যামিতিক নক্সা গড়ে
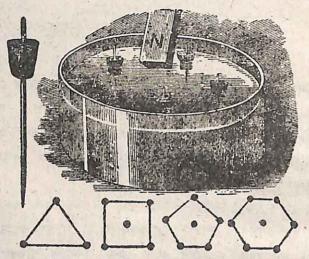
বাঁ-দিকে—কর্কের ভিতরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে সূচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ডানদিকে—জলভর্তি পাত্রে সূচ-বেঁধা কর্কগুলি ভাসছে
নীচে—কয়েকটা জ্যামিতিক নক্সার নমুনা দেখানো হয়েছে

উঠবে। বার-ম্যাগ্‌নেটের যে-কোন এক প্রান্ত এই ভাসমান সূচগুলির মধ্যস্থলে ধরলে জ্যামিতিক নক্সা বজায় রেখেই উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অনুযায়ী সূচগুলি দূরে সরে যাবে অথবা কাছে উপস্থিত হবে। কতকগুলি সূচ ভাসালে কোন্ রকমের জ্যামিতিক নক্সা তৈরি হবে, পাত্রের নীচের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। পাত্‌লা কাগজ কেটে সৈন্য-সামন্ত বা জীবজন্তুর ছবি কর্কের উপর বসিয়ে দিলে খেলাটা আরও চিত্তাকর্ষক করতে পার।

২.

রামায়ণে তোমরা রাম, সীতা ও রাবণের কাহিনী পড়েছ। সীতা হিন্দু রমণীর আদর্শ। রামের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ এবং রাবণের

প্রতি অপরিমেয় ঘৃণা সীতার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চুম্বকের খেলার মধ্য দিয়ে সীতার এই বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে দেখানো যেতে পারে। নীচের ছবি দুটো দেখলেই খেলার ব্যাপারটা অনায়াসে বুঝতে পারবে।

এক নম্বরের ক চিহ্নিত চিত্রে সূক্ষ্ম আলের উপর স্থাপিত মোটা কাগজের একখানা গোল চাক্‌তি। চাক্‌তিটার উপরে হাত-যোড়করা সীতার মূর্তি বসানো আছে। চাক্‌তিখানার তলায় ছোট্ট একটা

১নং চিত্র

সীতা রাবণের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে
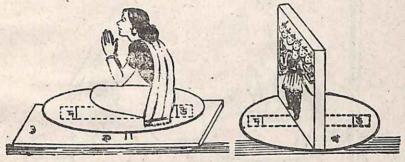
বার-মাগ্‌নেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক ঠিক মাঝখানে আড়াআড়িভাবে বসানো। চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মূর্তির সামনে এবং উত্তর মেরু পিছনের দিকে আছে। মূর্তি ও চুম্বকসহ চাক্‌তিখানা অনায়াসেই আলের উপর ঘুরতে পারে। খ চিহ্নিত আর একখানা চাক্‌তির উপরেই হোক, কি কাঠের উপরেই হোক, আর একটা বার-ম্যাগ্‌নেট বসিয়ে তার উপরে ছবির মত করে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বা ওই ধরনের এক টুকরো কাঠ বসিয়ে দিতে হবে। দেশলাইয়ের বাক্সের যে দিকটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিকে আছে, সে দিকটায় রাবণের মূর্তি এঁকে দাও। যে দিকটা উত্তর মেরুর দিকে সে দিকটায় রামের মূর্তি আঁক। চুম্বক দুটোকে সুবিধামত কাগজ বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তাহলেই খেলাটা আরও বেশী চিত্তাকর্ষক হবে। এবার রাবণের ছবিটা সীতার কাছে এনে বসিয়ে দাও। দেখবে—সীতা তার দিকে

মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরেই বসে থাকবে। কিন্তু রামের ছবিটাকে তার দিকে বসিয়ে দেওয়া মাত্র সীতা রামের দিকে যোড়হাতে ঘুরে বসবে।

আলের উপর ঠিকভাবে 'ব্যালান্স' করে বসানোর অসুবিধা হলে তলায় আড়াআড়িভাবে স্থাপিত চুম্বকটা সমেত সীতার মূর্তিটাকে একগাছা সরু সুতোর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে পার। এতেও ঠিক পূর্বের মত অবস্থাই হবে। দু-নম্বরের গ ও ঘ চিহ্নিত চিত্রে ব্যবস্থাটা

২নং চিত্র
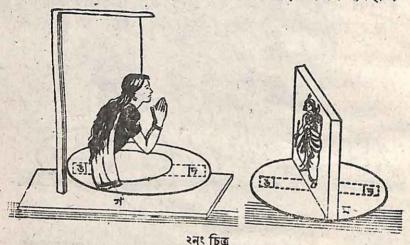
সীতা রামের দিকে মুখ করে আছে

দেখানো হয়েছে। কেবল সীতার মূর্তি দেখা যায় এরূপ ব্যবস্থা রেখে বাকী সবটাকে ঢেকে দেবে। এখানেও রামের মূর্তি কাছে আনা মাত্রই সীতা যোড়হাতে তার দিকে ঘুরে বসবে ; কিন্তু রাবণের মূর্তিটাকে তার দিকে আনলেই মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যাবে। কেন এমন হয়—সে কথাটা বোধহয় তোমাদের আব বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। দুটো চুম্বক কাছাকাছি আনলে সম-মেরু পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয় ; কিন্তু অসম-মেরু পরস্পরকে কাছে টেনে নেয়। অর্থাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। আবার উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু দক্ষিণ মেরুকে দূরে ঠেলে দেয়।